তিনটি প্রবন্ধ

- গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমালোচনার জবাবে
- বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখো
- সি পি আই'র কর্মসূচী প্রসঙ্গে

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

তিনটি প্রবন্ধ
Tinti Prabandha

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০১৬

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

প্রবন্ধ ৩টি :
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমালোচনার জবাবে / প্রকাশ কারাত ৩
বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখো/ সীতারাম ইয়েচুরি ২১
সি পি আই'র কর্মসূচী প্রসঙ্গে / প্রকাশ কারাত ৩৪

প্রচ্ছদ : সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমালোচনার জবাবে

প্রকাশ কারাত

[প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য মার্কসিস্ট' এর জানুয়ারি–মার্চ,২০১০-এর ২৬/১ সংখ্যায়। গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ভাষান্তর করে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হলো– অনুবাদক]

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম) ও বামপন্থীদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর এ নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা, নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক মৌলনীতি বলে বিবেচিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন নিয়েও প্রশ্ন এসেছে। এসব আলোচনা-সমালোচনা এসেছে এমনসব বদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে, যারা বামপন্থায় বিশ্বাসী ও সি পি আই (এম) সহযোগী বলে পরিচিত।

যেহেতু প্রশ্নগুলো এসেছে এমনসব কমরেড ও বন্ধুদের কাছ থেকে যারা পার্টি বিরোধী নন, বরং নিজেদের বামপন্থী পরিচিতিতে গর্বিত, সেহেতু উত্থাপিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে পার্টির বোঝাপড়া স্পষ্ট করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কেন্ত্রিকতার নীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের প্রাণভোমরা। তাই এ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

উত্থাপিত সমালোচনাগুলির আলাদা আলাদা জবাব না দিয়ে বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যেতে পারে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সবার মধ্যে সহমত তৈরি হয়েছে, তা কিন্তু নয়। তবে, অন্তত একটি বিষয়ে সবার মধ্যেই প্রায়-সহমত অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। সেটা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতি হওয়া উচিত নয়, কিংবা এর সংশোধন প্রয়োজন।

সমালোচনার মূল কথাগুলি কী কী ? এ ভাবে তা সাজানো হয়েছে –

১. স্বৈরতান্ত্রিক জারের একানায়কত্ব ও দমনপীড়নের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় লেনিন এক ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে মৌল সাংগঠনিক নীতি হিসেবে প্রণয়ন করেছিলেন। সে কারণে কেন্দ্রিকতার উপর বিশেষ জোর দিতে হয়েছিল। লেনিন বহুসংখ্যক পেশাদারি বিপ্লবী তৈরির কথা বলেছিলেন, এবং পার্টির গোপনীয়তা রক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশেষ করে যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সে ধরনের সমাজে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ।

২. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে এটা একটা যাজকতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত কাঠামো তৈরির দিকে নিয়ে যায়, যা কী না গণতন্ত্রকে সংকোচিত করে ও গণতান্ত্রিক কর্মধারায় ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে সমগ্র পার্টি পরিচালিত হয় পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে। পার্টি সভ্য ও কর্মীদের কাজ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ পালন করা। এই নির্দেশের বিরোধিতা করা, কিংবা ভিন্নমত প্রকাশের কোনও সুযোগ নেই। এসব শোনারও কেউ থাকে না।

৩. সৃজনশীল চিন্তা ও মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাই মূল প্রতিবন্ধক। সর্বোচ্চ কমিটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয় এবং এর পর আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কোনও নতুন চিন্তা, কিংবা পরিস্থিতির অন্যরকম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এমন কাঠামোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেয় এবং সাধারণ সভ্যরা তা রূপায়িত করে। এই কাঠামোর বাইরে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা ধমক দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, নতুবা একে 'শৃঙ্খলাহীনতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৪. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে গঠিত পার্টি সামগ্রিকভাবে সাধারণ সভ্যদের মতামত উপেক্ষা করতে পার্টি নেতৃত্বকে ক্ষমতা দেয়। তাতে পার্টি ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরে। ওপর-নিচ সম্পর্কের অসাবলীলতার পরিণামে কোনও ভুল অবস্থানের যথাসময়ে সংশোধনের পথ আটকে দেয়।

৫. সি পি আই (এম)-এর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রয়োগে বিকৃতি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেবল কেন্দ্রীকরণ ও নির্দেশই কার্যকর হয়েছে। নিচুতলার কমরেডদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে লেনিনীয় সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গণবিপ্লবী পার্টি (সালকিয়া প্লেনামের সিদ্ধান্ত) গঠন করা যাবে না। রণকৌশলগত লাইন গ্রহণে ভুল থাকলে সেই ভুল সাংগঠনিক কাঠামোকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এক

বলশেভিক পার্টি যখন থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করেছে এবং ১৯২১ সালের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে যখন সিদ্ধান্ত হলো যে, সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জন্যই এই মৌল সাংগঠনিক নীতি প্রযোজ্য হবে, তখন থেকেই সোস্যাল ডেমোক্রেট ও অ-মার্কসবাদী বামেদের দ্বারা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি আক্রান্ত হয়ে আসছে।

মার্কস–এঙ্গেল্‌স প্রণীত মার্কসবাদী তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাকে বিকশিত করতে গিয়ে লেনিন তিনটি মূল অবদান রেখেছেন। সেগুলি হলো– সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের অধীন জনগণের বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে ভূমিকা এবং একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের ধারণা।

পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো কেমন হবে এটাই বিষয়টির কেন্দ্রীয় অংশ নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক ভূমিকা কী হবে— এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং তাদের কাছে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। সে কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাও তাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে পুঁজিবাদকে উৎখাত করা, ভারতের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-জমিদার শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা করতে গেলে এমন ধরনের পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যা প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক স্তরে সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম। এটা এমন একটি পার্টি, যা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা সে যত সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন, তা বুর্জোয়া একনায়কত্বের রাষ্ট্রই শুধু নির্বাচনী সাফল্যের জন্যই কাজ করবে না, শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না।

মূল প্রশ্ন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে এবং বিপ্লবী গণআন্দোলন পরিচালনায় পার্টি নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে কী না। পার্টি সম্পর্কে লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য পার্টি নিজেকে প্রস্তুত ও উন্নত করতে হবে। সে কারণে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী অংশকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে হবে পার্টিকেই। তাহলেই সে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে তৈরি হবে। শ্রেণী সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সংগঠন ইস্পাতদৃঢ় হবে এবং আইনি, আধা-আইনি ও বেআইনি যে কোনও পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারবে। শ্রেণী রাজনীতির জন্য এমন একটা পার্টি গড়ে তুলতে হবে যে চলতি পরিস্থিতি মোকাবেলায় এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে সংগ্রামের ধরন পরিবর্তনে সে সক্ষম হয়। এর জন্য চাই একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি সংগঠন। মার্কসবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত পার্টির জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি। শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে একটি সমবেত কার্যক্রম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণে যৌথ কার্যক্রমের অনুশীলন, যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ও কাজের মধ্যে ঐক্যের শিক্ষা দেয়।

যৌথ কাজের ধারা কার্যকরী করতে গেলে সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধতি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের

মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সিদ্ধান্ত নয়, এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সমগ্র পার্টির যৌথ উদ্যোগ ও কার্যক্রমও অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এই শিক্ষা দেয় যে সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে চলতে হবে এবং ব্যক্তিগত মতামত পার্টি সিদ্ধান্তের অধীন থাকবে। লেনিন ও বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের যে বিতর্ক রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে হয়েছিল, সেখানে লেনিন বিপ্লবী পার্টি ও সাংগঠনিক নীতি সহ কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্তের কথা বলেছেন। রাশিয়ার বাইরে প্রখ্যাত মার্কসবাদী নেতাদের কয়েকজন কার্ল কাউৎস্কি ও রোজা লুক্সেমবার্গ পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত লেনিনের ধারণার সমালোচনা করেছেন। কাউৎস্কি বলেন, সংগঠন হচ্ছে বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পূর্বশর্ত। রোজা লুক্সেমবার্গ বলেন, পার্টি সংগঠন হচ্ছে বিপ্লবী গণআন্দোলনের ফসল। লেনিন বলেন, পার্টি ও তার সংগঠন হচ্ছে বিপ্লবী গণআন্দোলনের পূর্বশর্ত ও তার ফসল– এই দুটোই। লুকাস সুন্দরভাবে এর সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে বলেন– লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে, পার্টি যেমন বিপ্লবী গণসংগ্রামের স্রষ্টা, তেমনি বিপ্লবী সংগ্রামের ফসলও বটে। লেনিন আরও বলেন, পার্টিকে হতে হবে এমন একটি সংগঠন যা বিপ্লবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণ মোকাবেলায় নিজেকে সক্ষম করে তুলতে সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের একটি পার্টিকে কঠোরতম সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে গঠন করতে হবে। এটা এমন এক ধরনের শৃঙ্খলা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এবং সংগ্রামের ধরনে নমনীয়তা অনুসরণে পার্টিকে সক্ষম করে তুলবে।

মার্কসবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী কোনও পার্টিকে মতাদর্শ থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার পরিণামে পার্টি সংগঠনের মূল নীতিকে বর্জন করার বিপদ দেখা দেয়।

দুই

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে কী কী যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে?

ক) রাশিয়ার পরিস্থিতি সংক্রান্ত

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমালোচকদের একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে– রুশ বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ধরনের সাংগঠনিক নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়েছিল। জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনায় এ নীতির উদ্ভব ঘটেছিল। বলশেভিক পার্টির ওপর প্রচন্ড আক্রমণ ও নেতা-কর্মীদের নির্বাসনের মোকাবেলা করতে গিয়ে এ ধরনের একটি বেআইনি পরিস্থিতির উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল। বিপ্লবের পর এই সংগঠন আরও সংহত হয়। কারণ পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রতিবিপ্লবী ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়ে বিপ্লবী রাষ্ট্রকে উৎখাতের চেষ্টা চালায়। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও রাশিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সংগঠিত করে। ফলে বিপ্লবী পার্টিকে তখনকার কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিও রাশিয়ার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সাংগঠনিক নীতিমালাকে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, রুশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি যে ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করেছিল, সেটা কি ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে সব পার্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে?

তা হলে কি এটা বলা যায় যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে রাশিয়ার জন্যই এবং ভিন্ন দেশ ও পরিস্থিতিতে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কাজ করছে, সেসব দেশে ও পরিস্থিতিতে এই নীতি প্রযোজ্য হতে পারে না?

প্রবীর পুরকায়স্থ যেমনটা বলেছেন ঃ আসলে রাশিয়ার পার্টির সুনির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠে বিপ্লবের পর। পার্টিতে উপদল নিষিদ্ধ করা হয়। এখানে একটা যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে যে মহাশক্তিধর দেশগুলির আগ্রাসনের হাত থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার তাগিদে বিপ্লবী রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ধরনের পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে পার্টি আদেশ ও নিয়ন্ত্রণের আকারে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করেছিল, একটা সাধারণ নীতি হিসেবে নয়। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালে যে নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল, তার সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ আজকের বামপন্থী আন্দোলনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এ কথার অর্থ হচ্ছে বামপন্থীদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পর্যালোচনা করা দরকার। যখন অনেক শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিকেও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই সময় আদেশ ও নিয়ন্ত্রণের নীতিই সি পি আই (এম)-কে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এর কিছু কিছু সমস্যা অবাস্তব নয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পার্টির সামগ্রিক মতামতকে পার্টি নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করতে পারে। এর ফলে সাধারণ সভ্যদের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি হয়, পার্টি ও জনগণের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন পার্টির ভুল শোধরানোর প্রয়োজন দেখা দেয় তখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির কারণে যোগাযোগের অভাবে পার্টির ভুল অবস্থান সংশোধনে সময় দীর্ঘায়িত হয়।

এটা ঠিক যে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রণয়ন করেছিল। এই ধারণাকে রক্ত-মাংস দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে লেনিন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক রূপ ও তার অনুশীলন পার্টির বিপ্লবী চরিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে। শুধু রাশিয়ার পার্টি ও রুশ বিপ্লবই একমাত্র বিদেশি আক্রমণের শিকার হয়নি, যে আক্রমণ বিপ্লবী রাষ্ট্রকে দমন করতে চেয়েছিল। বিশ শতকের

প্রতিটি বিপ্লব প্রতিবিপ্লব-গৃহযুদ্ধ-বিদেশি আক্রমণ একই পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার হয়েছে। রাশিয়ায় যেমন জারের অত্যাচার, চীনের কমিউনিস্টরা কুয়োমিনটাঙের বর্বর নিপীড়নের শিকার হয়েছে। রাশিয়ায় যেমন গৃহযুদ্ধ হয়েছে, তেমনি হয়েছে চীন, কিউবা ও অন্যান্য দেশেও। বিদেশি আক্রমণ হয়েছে চীন, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া ও কিউবায়ও। এমনকি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত চিলির বামপন্থী সরকারকেও সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার হতে হয়েছে।

চীন, ভিয়েৎনাম ও কোরিয়ার বিপ্লবের কথা ছেড়ে দিন। কিউবার বিপ্লব এক জ্বলন্ত নিদর্শন। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু বিপ্লব করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি। পরে এই বিপ্লবী শক্তিগুলি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে নিজেদের সংহত করে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করেই পার্টি পুরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এ পর্যন্ত কোনও বিপ্লব, কিংবা সমাজতন্ত্র অভিমুখে এগোনোর একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে পার্টি কিংবা বিপ্লবী সংগঠন, যারা এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করেনি।

ভেনেজুয়েলায়, যেখানে একটি 'বিপ্লবী প্রক্রিয়া' কার্যকর ছিল, সেখানে চাভেজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে তাঁর এই সংগ্রামকে পার্টিতে রূপান্তরিত করতে হবে। তবে, সেই পার্টি পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে নয়, সেখানে থাকবে শুধু চাভেজকে কেন্দ্র করে এক ধরনের কেন্দ্রিকতা। একটি কেন্দ্রীভূত পার্টির অনুপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া কী ভাবে এগোবে তা দেখার অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।

বিপ্লবী সংগ্রামের পরিচালক পার্টিগুলিকে কেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিই অনুসরণ করতে হবে? কারণ কোনও বিপ্লবকেই গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সফল করতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেকটি বিপ্লবী সংগ্রামকেই সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণের মোকাবেলা করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছাড়া পার্টি নিরস্ত্র হয়ে যায় এবং তাকে বিপ্লবী সংগঠন বলা যায় না। লেনিন এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন – আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র আজও এবং সব দেশেই কেন্দ্রীভূত প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনায়ও চাই কেন্দ্রীভূত জনশক্তির প্রতিনিধিস্থানীয় একটি পার্টি। এ কথা আজও একশ'ভাগ সত্যি। বরং, আজকের দিনে, যখন সাম্রাজ্যবাদের হাতে রয়েছে অতি উন্নত ও সচল সশস্ত্র বাহিনী, যাকে যে-কোনও সময় যে-কোনও বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে চারদিক থেকে দ্রুত জড়ো করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের শুধু প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপই নয়, বিশ্বে প্রভুত্বকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবেলা না করে কোনও বিপ্লবই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতেও

গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আশা বাতুলতা মাত্র। লেনিনের উদ্বৃতি দিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন– 'কোনও বিপ্লব আত্মরক্ষায় ক্ষমতাধর না হলে তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করার অর্থ হয় না'। আত্মরক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্রভান্ডার হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা।

এর সঙ্গে আরেকটি যুক্তি খাড়া করানো হয়েছে। বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই কেবল পার্টির সাংগঠনিক নীতি হিসেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা খাপ খায়। লেনিনও বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই এর প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু, যে-সব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনি বৈধতা ও বুর্জোয়াদের জারি করা গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে, সে-সব দেশে এই নীতি প্রযোজ্য হবে কী করে?

শুধু তো প্রতিবিপ্লবী হিংসা মোকাবেলা করা নয়, পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিচালনা করতে হবে। পার্টিকে তার মতাদর্শগত ভিত্তি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসক শ্রেণীগুলি পার্টির রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংহতি নষ্ট করতে ও পার্টিকে একটি সংস্কারবাদী শ্রেণীসমঝোতাকারী শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য অনবরত চেষ্টা চালায়। মনোজগতে ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রে নিরন্তর সংগ্রাম কার্যকরীভাবে পরিচালনা করতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বর্জনকারী কোনও পার্টির পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছাড়া পার্টি একটা আলোচনার মঞ্চ কিংবা বিতর্কসভায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক কমিউনিস্ট পার্টিই অ-বিপ্লবী পরিস্থিতিতে কাজ করেছে। চলতি একুশ শতকের প্রথম দশকেও এই ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই পার্টিগুলির মধ্যে অনেক পার্টিই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার দৌলতে টিকে থাকতে পেরেছে। যত মতাদর্শগত কিংবা রাজনৈতিক দুর্বলতা, বা ভুলই থাক না কেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাই তাদের বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে জীইয়ে রেখেছে। যে-সব পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বর্জন করেছে, হয় তারা কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র হারিয়েছে, নতুবা বিভাজিত হয়েছে। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। আশির দশক পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বাইরে ইতালির পার্টি ছিল বৃহত্তম পার্টি। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার অনেক আগেই ইতালির পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র হারাতে শুরু করে। প্রথমে এরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বর্জন করে এবং শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ মার্কসবাদকেই পরিত্যাগ করলো।

এমনকি, কিছু গণভিত্তিসম্পন্ন কমিউনিস্ট পার্টিকে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় কাজ করতে গিয়েও শ্রেণীশত্রুদের অবিরত আক্রমণ ও চাপের মুখোমুখী হতে হয়। অনবরত এই আক্রমণ ও চাপ আসে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পার্টির মধ্যে অনৈক্য তৈরি ও

পার্টিকে দুর্বল করতে। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও শ্রেণীসংগ্রাম ও শাসকশ্রেণীগুলির নীতির বিরুদ্ধে পার্টিকে গণসংগ্রাম চালাতে হয় এবং তাতে পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির নিরন্তর আক্রমণের শিকার হয়। সি পি আই (এম)'রও এই অভিজ্ঞতা রয়েছে। পার্টির কাছে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রাথমিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই কাজ কার্যকরভাবে করতে গেলে এমন ধরনের একটি সংগঠনের প্রয়োজন, যা কী না পার্টিতে অনৈক্য তৈরির উদ্দেশ্যে নানা দিক থেকে আসা প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে মোকাবেলা করতে পারে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছাড়া কেবল একটি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিই গড়া যায়, বিপ্লবী পার্টি গড়া সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে 'আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো'-র সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত এমন কথাও দাবি করা হয়েছে যে, এই নীতি 'সমগ্র পার্টির মতামত'-কে অগ্রাহ্য করতে পার্টি নেতৃত্বকে ক্ষমতা দেয়। কেন্দ্রিকতা বলতে কি আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ বোঝায়? পার্টি নেতৃত্ব সমগ্র পার্টির উপর ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা পায়? রাজনৈতিক সচেতন একজন পার্টি সভ্যের কাছে কেন্দ্রিকতা হচ্ছে সমষ্টিগত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ, আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ নয়। কেন্দ্রিকতা ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র উভয়ের একই সঙ্গে অনুশীলনের নামই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। সি পি আই (এম)-র গঠনতন্ত্রের ১৩ নং ধারার পুরোটাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি ও তা কীভাবে রূপায়িত হবে, সবিস্তারে তার উল্লেখ রয়েছে। এই ধারার গ ও ঘ উপধারায় কী বলা হয়েছে–

গ) সমস্ত পার্টি কমিটিকে তার কাজকর্ম সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরবর্তী নিচের কমিটিতে রিপোর্ট করতে হবে এবং নিচুতলার সমস্ত কমিটিগুলিকেও একই বিষয়ে পরবর্তী উচ্চতর কমিটিতে রিপোর্ট করতে হবে।

ঘ) সমস্ত পার্টি কমিটিগুলিকে, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলিকে সব সময় নিচের কমিটিগুলির ও সাধারণ পার্টি সভ্যদের মতামত ও সমালোচনার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

সি পি আই (এম)-র গঠনতন্ত্রে পার্টি ইউনিটে সকল বিষয়ে পার্টি সভ্যদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে উপদল গঠন কিংবা উপদলীয় প্রবণতার অনুমতি দেয় না। পুরকায়স্থ বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় এটাকে একটি নির্দিষ্ট গৃহীত পদক্ষেপ বলে ভাবতে পারেন। আসলে, পার্টির ভেতরে উপদল গঠন পার্টি সংগঠনের সংহতি ধ্বংস করে দেয় এবং পার্টির সমষ্টিগত ইচ্ছার যৌথ বাস্তবায়নে বাদ সাধে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ সময়ের ঘটনাবলী স্মরণ করুন। গোরবাচভের নেতৃত্বে পার্টির ভেতরে উপদল গঠনের অনুমতি দেওয়া হলো, যা কি না সোভিয়েত পার্টির ভাঙনের

কাজকে ত্বরান্বিত করেছে।

পার্টি নেতৃত্ব পার্টির সামগ্রিক মতামত শুনবে না এটা কি কখনও সম্ভব? বরং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা যেখানে অনুপস্থিত অথবা থাকলেও বিশ্রিভাবে লঙ্ঘিত হয় সেখানে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটিগুলির মতামত কী ভাবে প্রকাশ পেতে পারে? রাজ্য কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি কোনও বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি কি আমাদের মতো পার্টিতে তা এক কথায় অগ্রাহ্য করতে পারে? অথবা পলিটব্যুরো কি কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে?

খ) দমবন্ধকর পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় যে যুক্তিটি দাঁড় করানো হয়েছে তা হলো সাংগঠনিক নীতি হিসেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অন্তর্নিহিতভাবেই কেন্দ্রীকরণের দিকে ঠেলে দেয় এবং পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে খর্ব করে। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যেখানে নিচুতলার কমিটিগুলি উপরতলার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকে। ফল দাঁড়ায় জবুথবু অবস্থা এবং অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকরণ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে এই ভাবে গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি উপেক্ষিত হয় ও বিরুদ্ধ মত অবদমিত হয়।

এটা অধিকতর বাস্তবসম্মত সমালোচনা। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের শাসক, কিংবা বিরোধী অবস্থানে থাকা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজকর্ম থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা রাজ্য কমিটির মতো নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বাছাই করা কিছু ধারা অনুসরণ করে অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেছে, শেষ কথা বলার অধিকার পেয়েছে। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কিংবা অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতার বহু উদাহরণ রয়েছে বিভিন্ন দেশে, যেখানে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে খর্ব করা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পদে পদে লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে শুধু কেন্দ্রিকতার মূর্ত রূপ হিসেবে বিবেচনা না করে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাস্তব অনুশীলনই একে অধিকতর গণতান্ত্রিক করে তুলতে পারে। অনেক পার্টি তত্ত্বগতভাবে এর যে অনুশীলন চালায় তা বাস্তবে শুধু গণতন্ত্রই থাকে। পার্টিগুলি যে গণতন্ত্র অনুশীলন করে তার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুও দেখা গুরুত্বপূর্ণ।

পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় ধারণা কোনও সামরিক শৃঙ্খলা নয়, কিংবা তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে পার্টির ভেতরে তুমুল বিতর্ক ও আলোচনা নিষিদ্ধ করে না। বরং এটা পার্টিতে আলোচনা

ও বিতর্কের সুযোগ যথাসম্ভব প্রসারিত করার পক্ষে অভিমত দেয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক লাইন বাস্তবায়নে পার্টির ঐক্য শক্তিশালী করা জরুরি।

লেনিন যে ভাবে বলেছেন ঃ

যুদ্ধের উত্তাপে সর্বহারার সৈন্যদল যখন শিরায় শিরায় টানটান উত্তেজনা অনুভব করে তখন তার অনুগামীদের কোনও সমালোচনার অনুমতি দেওয়া চলে না। তবে কাজে ঝাঁপানোর আগে ব্যাপকতম খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি ও ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কোনও প্রশ্নাতীত অন্ধবিশ্বাস নয়। তার প্রকৃত নীতি ও নিয়ম-কানুন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পার্টিতে এবং একই পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রূপে প্রতিভাত হতে দেখা গেছে। অন্য দিকটিও বোঝার প্রয়োজন আছে যে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতা সব সময়ের জন্যই একই সঙ্গে একই অনুপাতে স্থির থাকবে – এটা বলা যায় না। এটা নির্ভর করবে কোনও দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর – রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পার্টির শক্তি, পার্টি সভ্যদের রাজনৈতিক চেতনার স্তর ও নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ সভ্যদের আস্থার উপর।

নানান ইস্যুতে ট্রটস্কি, লেনিনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে বলেছেন ঃ

সমস্যাটা যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের, তখন গণতন্ত্র কেন্দ্রিকতার অধীন থাকবে। আবার যখন পার্টি অনুভব করবে যে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তখন গণতন্ত্র তার অধিকার ফিরে পাবে। গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সংগ্রামে এর কার্যকারিতা বোঝা যাবে। সময় বিশেষে এটা লঙ্ঘিত হলেও তার পরই এর পুনপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তেমনিভাবে, সম্মেলনের আগে গণতন্ত্রের অনুশীলন চলে এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টির রাজনৈতিক লাইন গৃহীত হয়। লাইন রূপায়ণের সময় কেন্দ্রিকতার প্রশ্নটি সামনে এসে যায়।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির, বিশেষ করে যে-সব পার্টি সফলভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করেছে, সেই সব পার্টির অভিজ্ঞতা থেকে সি পি আই (এম) শিখতে আগ্রহী। এদের মধ্যে কয়েকটি পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি লঙ্ঘন করেছে। ব্যক্তিপুজো ও নেতা-কেন্দ্রিক অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বর্জন করেছে।

এ ধরনের বিচ্যুতি সি পি আই (এম)-কে কখনওই প্রভাবিত করতে পারেনি। নেতৃত্বের যৌথ কাজের ধারা ও নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি এ ধরনের বিচ্যুতি প্রতিহত করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে আমাদের পার্টিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অবশ্যই

অনুশীলন করতে হবে। বৃহত্তর বামঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে এটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। যেমনি ভাবে বামপন্থী দলগুলিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য করতে পারি না, তেমনিভাবে অন্য কোনও বামদলও আমাদের এই সাংগঠনিক নীতি অনুসরণের বিরোধিতা করতে পারে না।

এমন কি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বে এবং তার পরও বহুদলীয় ব্যবস্থায় থাকাকালীনও কমিউনিস্ট পার্টিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই নীতিই হবে আমাদের মূল হাতিয়ার, যা দিয়ে কার্যকরভাবে আমরা যাবতীয় প্রতিকূলতা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে মোকাবেলায় সক্ষম হতে পারব এবং আরও বেশি সংখ্যায় শ্রমজীবী জনগণকে আমাদের পাশে টেনে আনতে পারব।

অশোক মিত্র অবশ্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বাতিল করে দেননি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম)-এ এই নীতির প্রয়োগের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন 'এখানে অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই।' এ ধরনের ভুলই পশ্চিমবঙ্গে জনগণ থেকে পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

এর আগে কখনও কখনও অশোক মিত্র সি পি আই (এম) ও শিল্পায়ন এবং জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গে নয়া-উদারিকরণের নীতিসমূহ রূপায়ণ করতে গিয়েই পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই মূল্যায়ন সঠিক, তাহলেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার খর্বায়ন ও অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতাকে দায়ী করা যায় না। বাস্তবে, অশোক মিত্র অন্য এক জায়গায় বলেছিলেন– পশ্চিমঙ্গের গণআন্দোলনের মেরুদন্ড হচ্ছে সি পি আই (এম)-এর আত্মনিবেদিত ও সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের পার্টির নির্বাচনী বিপর্যয়ের পেছনে ছিল রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা ও বিচ্যুতি।

পার্টির লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনাতে এই কারণগুলি চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতা এই বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ নয়।

গ) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তত্ত্ব ও চালু প্রথা

প্রভাত পট্টনায়েক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে সমালোচনা করেছেন। তত্ত্বকে এমনভাবে দেখা হচ্ছে যেন এ নিয়ে বিতর্কের আর সুযোগ নেই, এর বিকাশের দরজা বন্ধ। প্রচলিত প্রথা হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেল্‌স ও লেনিন যে তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন তাকেই অনুসরণ করতে হবে, তারই ব্যাখ্যা চলবে।

মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য দরজা খোলা রাখা দরকার, যার ফলে অ-মার্কসীয় ধ্যানধারণার মূলস্রোতের তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে বিতর্ক করা যায়। এখন, তত্ত্ব কেবল নেতাদেরই সম্পদ এবং এর প্রয়োগ করবে নিচুতলার কর্মীরা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার জন্যই এ পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং তা এই নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

একটা বিপ্লবী পার্টির কাছে খোলামেলা বৈজ্ঞানিক আলোচনা অক্সিজেনের মতো। এই আদান প্রদান ছাড়া এ তত্ত্ব টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এ ধরনের মুক্ত আলোচনার জন্য বৌদ্ধিক স্বাধীনতাই একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। সেখানে বহু মতের অস্তিত্ব থাকার (বহুদলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যা সংগতিপূর্ণ) সম্ভাবনাকে মেনে নিতে হবে। পাশাপাশি একটা বিপ্লবী পার্টির সাংগঠনিক নীতি হিসেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

তত্ত্ব যে একটি বদ্ধ পদ্ধতি নয়, এর শুধু ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই করা যাবে, এর বেশি কিছু নয়– এ প্রশ্নে পট্টনায়েকের বক্তব্য ঠিক আছে। মার্কসবাদী তত্ত্ব নিজেকে অনবরত বিকশিত ও সময়োপযোগী করে আসছে। এর জন্য চাই মুক্ত আলোচনা যেখানে নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে মতবিনিময়, মতাদর্শগত বিতর্ক চালানো যাবে। তিনি এটাও ঠিক বলেছেন যে অতীতে তত্ত্ব সম্পর্কে একটা অন্ধবিশ্বাস কার্যকর ছিল।

কিন্তু তত্ত্ব সম্পর্কে এই ভুল ধারণার সঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিমালাকে যুক্ত করাটা সঠিক নয়। তত্ত্বগত বিষয়ে আলোচনার ব্যর্থতা এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে তত্ত্বের বিকাশ না ঘটানোর চেষ্টা তত্ত্বের সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসের তুলনা, যার ফলে তত্ত্বের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, যা পট্টনায়েক নিজেই বলেছেন– এ অবস্থার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে দায়ী করা চলে না। বরং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিধির মধ্যেই তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক গবেষণা চলতে পারে।

লুকাস এক সময় বলেছিলেন, সংগঠন হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সেতুবন্ধ। বিভিন্ন ধরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটবে, পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক হতেই পারে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সাংগঠনিক কাঠামো দরকার। এখানেই তত্ত্বের স্পষ্টিকরণ ও পরীক্ষা হয়। আলোচনায় বহু মত উঠে এলেও সংগঠনের মাধ্যমে তা কার্যকর করার জন্য একটিমাত্র উপসংহার ও অভিমুখ নির্বাচন করতে হবে। তত্ত্ব কিংবা রাজনৈতিক-রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা বিচার করতে হবে অভিজ্ঞতার নিরিখে এবং ওই লাইনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এ ধরনের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিকে বাতিল করে না, কিংবা ব্যাহত করে না। বরং, এই কাজটি ঠিকমতো করার জন্যই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এমন একটি কাঠামোর কাজ করে যেখানে পার্টির সংহতি, মতাদর্শগত ধারাবাহিকতা ও রণকৌশলে

নমনীয়তা বজায় থাকে।

তত্ত্বের সামগ্রিক বিচারের জন্য খোলামেলা আলোচনা ও অবিরত পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু আলোচনার পর গৃহীত রাজনৈতিক লাইন বা উপসংহারের ক্ষেত্রে এটা চলে না। পার্টির সিদ্ধান্ত বা লাইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'বহুমত'-এর সুযোগ থাকে না। তত্ত্বগত আলোচনা স্তব্ধ করার জন্য পার্টির শৃঙ্খলাজনিত প্রশ্নের অবতারণা করা যায় না, বরং একই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে সমগ্র পার্টি কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই শৃঙ্খলা আরোপিত হয়।

ঘ) সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক প্রবণতার চ্যালেঞ্জ

নানা ধরনের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক প্রবণতা যা শোধনবাদী রাজনীতিরই অঙ্গ, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তার যোগসূত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জাভেদ আলম, যিনি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করেছেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর লাভবান হওয়া সংক্রান্ত ভারসাম্যহীন মূল্যায়ন এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা – এগুলো সবই মার্কসবাদী অবস্থান থেকে দূরে সরে যাওয়ার লক্ষণ। ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে কষ্টসাধ্য অধিকার অর্জনের সঠিক বক্তব্য দিয়ে শুরু করে আলম সাহেব ঘোষণা করলেন 'শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারের সম্পূর্ণ এক নতুন তালিকা তৈরি হয়েছে এবং তা গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর এই সাফল্য 'একইসঙ্গে বুর্জোয়াদের অবাধ বিশেষ ক্ষমতা সংকোচিত হওয়ারই প্রতিফলন'।

শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকারগুলির খর্বায়ন আলম সাহেবের চোখে পড়লো না, চোখে পড়লো না 'গভীরে প্রোথিত' অধিকারগুলি যে '৮০-র দশকে প্রথমে ব্রিটেন ও আমেরিকা, তারপর সারা দুনিয়াজুড়ে নয়া উদারবাদের আগ্রাসনের বলি হচ্ছে? এমনকি ধর্মঘটের অধিকার ও যৌথ দর কষার অধিকার পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। উদারবাদী গণতন্ত্রে একমাত্র ভোটের অধিকারটাই কোনওমতে টিকে আছে।

আলম সাহেব পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মুক্তিদাতার ভূমিকাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন এবং তার শ্রেণীচরিত্রকে খাটো করেছেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্র নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমানাধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও ক্রমান্বয়ে তা সীমিত করার দিকে অগ্রসর হয়। এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অধিকার সম্প্রসারিত করতে অস্বীকার করে। গণতন্ত্র, বাজার ও পুঁজির অধীন হয়ে পড়ে এবং এটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

জাভেদ আলম, সি পি আই (এম)-র রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। সি পি আই (এম) নেতৃত্ব অতীতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ না দেওয়ায় দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে এই ভুল রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও রণকৌশল কড়া হাতে চাপানো হয়েছে এবং অন্ধভাবে শৃঙ্খলা আরোপিত হয়েছে।

এ ধরনের ভুল সমালোচনা আরও অনেকে করেছেন। রণকৌশল যদি ভুল বলে বিবেচিত হয় তা হলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বাস্তব অনুশীলনে, বা কাজের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে। যেমন ধরুন, উপা সরকারের উপর থেকে জুলাই ২০০৮-এ সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে তা হলে তা অগণতান্ত্রিক আদেশাত্মক কাঠামোর জন্যই হয়েছে। একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাধারণ সভ্য/সমর্থকদের চিন্তাভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সি পি আই (এম) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কাঠামোর মধ্যে রণকৌশল ও পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আন্তঃপার্টি আলোচনা ও বিতর্ক সংগঠিত করেছে। যেমন ধরুন, ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রশ্নে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মতামত নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসেও পর্যালোচিত হয় ও পার্টির অবস্থান স্পষ্ট করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। যারা পার্টির রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে একমত নন তারা এই বলে দাবি করতে পারেন না যে, তারা যে সিদ্ধান্ত পছন্দ করেন না গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার দৌলতেই সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তারা তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানতে ও কার্যকর করতে কার্যত বিরোধিতাই করেন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচিন নয় যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা পার্টিতে সমালোচনা ও বিরুদ্ধ মতকে দাবিয়ে রাখে।

সারসংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা একগুচ্ছ সাংগঠনিক অনুশাসন নয়। এই নীতি সম্পর্কে নিচে বিবৃত কথাগুলি মনে রাখতে হবে ঃ

১. যে পার্টি বিপ্লবের রণনীতি গ্রহণ করেছে এবং সেই মতো রণকৌশল ঠিক করেছে, অপরিহার্যভাবেই সেই পার্টির সাংগঠনিক নীতি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা।

২. ভুল মতাদর্শগত বোঝাপড়া এবং ভুল রণনীতি ও রণকৌশল সংগঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত বিচ্যুতি ও ভুল প্রবণতাও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৩. মার্কসবাদী মতবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পার্টির মূল সাংগঠনিক নীতি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। কিন্তু, সব সময়ের জন্য ও সব দেশের জন্য এটা একই রকম ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না।

পরিস্থিতির রকমফেরে এবং এমনকি একই পার্টির বিভিন্ন পর্যায়েও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকবে।

৪. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রের কোনও স্থায়ী অনুপাত হয় না। পার্টি যখন সম্মেলন ইত্যাদিতে আলোচনা করে নীতি নির্ধারণ করে, তখন গণতন্ত্র সক্রিয় থাকে। পার্টি ফোরামে খোলামেলা আলোচনায় গণতন্ত্রের প্রাধান্য থাকে। সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর তার রূপায়ণে কেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পায়। আবার যখন আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার কাজের পর্যালোচনা হবে তখন আবার গণতন্ত্র স্বমহিমায় আবির্ভূত হবে।

৫. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন কিছু আনুষ্ঠানিক নীতি ও অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এটা নির্ভর করে পার্টি সভ্যদের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত চেতনার মান, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডল, নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা এবং পার্টি সংগঠন গড়ার কাজে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মীমাংসা ও সংগ্রামের অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর।

তিন

ভারতের অভিজ্ঞতা

আমাদের পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে এসেছে। পার্টি গঠনের প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ বলে মনে করত। বিষয়টা ছিল এ রকম যে, তাত্ত্বিক বিষয় ও রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। অবিভক্ত পার্টিতে এই মনোভাব দীর্ঘকাল কার্যকর ছিল, যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের বিকাশ সাধনে এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণের কাজকে ব্যাহত করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্বাধীনতা লাভের পর, সংগঠনের ওপর শোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের প্রভাব পড়ে। তবে, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন কখনও বাতিল হয়নি।

সি পি আই (এম) গঠিত হওয়ার পর অবিভক্ত পার্টিতে যে সাংগঠনিক প্রথা চালু ছিল তার চুলচেরা পর্যালোচনা করা হয়। তারই ফলস্বরূপ 'পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত কর্তব্য' শীর্ষক

একটি দলিল প্রকাশিত হয়। সেখানে পার্টি গঠনের ভিত্তি ও পরিচালনার বিষয়ে নীতি বিবৃত হয়। তখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে শোধনবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বলা হয়, 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, যা কি না একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির জন্য সর্বোচ্চ ও মৌলিক সাংগঠনিক নীতিমালা, তা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও অবনমিত।'

কী ভাবে আমাদের পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন কার্যকর হলো? এটা মোটেই সোভিয়েত পার্টি কিংবা অন্য কোনও পার্টির যান্ত্রিক অনুকরণ ছিল না।

সালকিয়া প্লেনামে সি পি আই (এম) একটি গণবিপ্লবী পার্টি গঠনের আহ্বান জানায়। এ ধরনের পার্টি গঠিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ওপর দাঁড়িয়ে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছাড়া কেবল একটি গণপার্টি গড়া সম্ভব। এই নীতি প্রয়োগে নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পার্টির গঠনতন্ত্রে বর্ণিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে পাথেয় করে পার্টি কমিটিগুলি পার্টির গণভিত্তি তৈরি করেছে এবং পার্টির শৃঙ্খলা মেনে কাজ করতে আগ্রহী হাজার হাজার কমরেডকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সি পি আই (এম) যে ভাবে পার্টিতে বিস্তৃত আলোচনা চালায় এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়, ভারতে এমন আর কোনও পার্টি নেই। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুশীলনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

সি পি আই (এম) জন্মলগ্ন থেকেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাজ করছে। শুধু সংসদে ও বিধানসভায় নয় এই দল রাজ্য সরকারও পরিচালনা করেছে। কয়েকটি রাজ্যে জননির্বাচিত সংস্থায়ও কাজ করছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলনের মাধ্যমেই নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে। হাজার হাজার পার্টি সভ্য এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এই কমরেডদের কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা নিহিত রয়েছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কাঠামোর মধ্যেই।

বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পার্টিকে কাজ করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে রাজ্যে রাজ্যে সুনির্দিষ্ট রণকৌশল স্থির করার ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটিগুলিকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বশাসন দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ এই নয় যে গণআন্দোলন ও গণসংগঠনের শক্তি বাড়াতে সব রাজ্যকে একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

পার্টি শুধু গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমেই জনসংযোগ বজায় রাখে না, বিভিন্ন স্তরে পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেও পার্টি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। শুধু কেন্দ্রীভূত লাইন অনুসরণ করেই এসব সংস্থায় কাজ করা সম্ভব নয়। পার্টি কর্মী ও সভ্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই গণরাজনীতির প্রসার ও নানা ধরনের সংস্থায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা যায়।

সংশোধনের ব্যবহারিক প্রক্রিয়া

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলনের অভিজ্ঞতা

নিয়ে সি পি আই (এম) পর্যালোচনা করেছে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে সোভিয়েত ও আন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি লংঘনের সমালোচনা করা হয়। অতিমাত্রিক কেন্দ্রিকতা, আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ও আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অভাব ছিল বলে উল্লেখ করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে-সব ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি চাপিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা শুধু কমিউনিস্ট পার্টিরই নয়, রাষ্ট্রেরও নির্দেশক নীতি হয়ে দাঁড়ায়। এটা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে খর্ব করেছে।

এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সি পি আই (এম) কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

ক) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হবে পার্টির সাংগঠনিক নীতি। এটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আরোপ করা যাবে না। ১৯৬৪ সালে গৃহীত সি পি আই (এম)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে। ২০০০ সালে গৃহীত সময়োপযোগী কর্মসূচীতে এই বক্তব্যটি বাতিল করা হয়।

খ) পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ পার্টিতে গৃহীত হয়। যেমন, সম্মেলনের সময় উচ্চতর কমিটির পক্ষ থেকে পরবর্তী নিচুতলার কমিটির সম্পাদক পদের জন্য কোনও নাম প্রস্তাবিত হবে না। নতুন কমিটির প্যানেল তৈরির কাজ ইতোমধ্যে বিদায়ী কমিটি সেরে ফেলেছে।

গ) পার্টি সম্মেলনে ভোট হলে গোপন ব্যালটে তা করতে হবে।

ঘ) কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন পার্টি কংগ্রেস থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবে। এটা কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশন হবে না।

ঙ) গণসংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক কর্মধারা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমস্ত পদাধিকারী কিংবা কমিটির সদস্যদের নাম পার্টি ঠিক করে দেবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জাভেদ আলম পার্টি কমিটির নির্বাচন-প্রক্রিয়াকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, নিচের কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা উপরের কমিটি থেকে প্রস্তাব করা হয়। এটা সঠিক তথ্য নয়। নতুন কমিটির প্যানেল তৈরি করে সংশ্লিষ্ট স্তরের বিদায়ী কমিটি এবং সম্মেলন তা চূড়ান্ত করে। উপরের স্তরের কমিটির পক্ষ থেকে কোনও প্যানেল প্রস্তাব করা হয় না। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে হাততোলা ভোটে নাকি নির্বাচন করা হয়। এই তথ্যও সঠিক নয়। প্যানেল উপস্থাপনের পর যদি কোনও নতুন নাম বা একাধিক নাম প্রস্তাবিত হয় ও ভোট হয়, তা হলে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা গোপন ব্যালটেই ভোট দেন। যদি

প্যানেলের বাইরে কোনও নতুন নাম না আসে তখনই কেবল হাততোলা ভোট সম্পন্ন করা হয়। কোনও প্রতিনিধি এ ক্ষেত্রে প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন, কিংবা ভোটদানে বিরত থাকতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে পার্টি সভ্যদের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত চেতনার মানের উপর। চেতনার মান দুর্বল হলে পার্টির নীতি তৈরিতে ও আলোচনায় অংশ নিতে পার্টি সভ্যরা অপারগ হন। ফলে সভ্যদের গণতান্ত্রিক সংযুক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উপদল, যৌথ কর্মধারার অভাব, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের ভুল কর্মপদ্ধতি, ইত্যাদি নানা ধরনের সাংগঠনিক সমস্যার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি লঙ্ঘিত হয়। এসব প্রবণতা সংশোধন ও দূর করার কাজটি সঠিক রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতির উপর ভিত্তি করে পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামেরই অঙ্গ। এর জন্যই শুদ্ধিকরণ অভিযান চালু করা হয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি শক্তিশালী করা ও এই নীতির লঙ্ঘন প্রতিহত করা।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীন বহুদলীয় ব্যবস্থায় কাজ করতে গিয়ে সি পি আই (এম)-কে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকেই অনুসরণ করতে হয়। কারণ, আমাদের কাজ করতে হয় একটি বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে, যেখানে জনগণতন্ত্রে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নত। অবশ্য, তা প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রয়োজন।

সি পি আই (এম)-এ যদি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা লঙ্ঘিত হয় ও এই নীতির যথাযথ অনুশীলন না ঘটে, তা হলে সামাজিক রূপান্তরের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে পার্টি এগোতে পারে না। তাই, পার্টিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে যাতে পার্টির ভুল কর্মপদ্ধতির কারণে পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সতর্ক নজর রাখাই যথেষ্ট নয়, এই নীতি লঙ্ঘনের যে-কোনও প্রবণতার বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, রাজনীতিকে যান্ত্রিকভাবে সংগঠন থেকে আলাদা করে দেখা চলে না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমালোচকরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সি পি আই (এম)-কে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পার্টির মৌলিক চরিত্র ও রণনীতি বর্জনের কথাই বলেছেন। সি পি আই (এম)-এর দৃঢ় অভিমত হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছাড়া কোনও গণবিপ্লবী পার্টি গঠিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল উপাদানকে সুরক্ষিত রাখতে সমগ্র পার্টিকে সংগ্রাম চালাতেই হবে।

বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখো

সীতারাম ইয়েচুরি

[ধারণা তৈরির দুটো পদ্ধতি আছে। একটি বিষয়ীগত যা মনগড়া, কিংবা বস্তুনিষ্ঠ নয় এমন। যা বাস্তব অবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে তৈরি হয় না। আরেকটি হচ্ছে বিষয়গত — যার ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, বস্তুনিষ্ঠ। কমিউনিস্টদের কাছে বিষয়ীগত ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিষয়গত ধারণাই কমিউনিস্টদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় — অনুবাদক]

প্রত্যেক বিপ্লবী পার্টিকে প্রতিমুহূর্তে নজর রাখতে হয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন শক্তিশালী করার উপর। বলা বাহুল্য যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও অগ্রাধিকারগুলি নির্ধারিত হয় কীসের ভিত্তিতে?— নির্ধারিত হয় সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও কাজের অভিমুখ সম্পর্কে পার্টির নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। পার্টির কর্তব্য ও কাজের অভিমুখ ঠিক হয় কী করে?— ঠিক হয় সেই সময়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ থেকে, যে বিশ্লেষণ পার্টির রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইনে বিবৃত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা ও পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার পাশাপাশি পার্টি সংগঠনকে পার্টির সব সদস্য ও অনুরাগীদের চলতি কর্তব্য পালনে সক্রিয় করে তুলতে দক্ষ হতে হবে।

বহু দশক ধরে আমরা লেনিনীয় পদ্ধতির কথা বলে আসছি। সেটা কী?— সেটা হচ্ছে, " নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট মূল্যায়ন করাই হচ্ছে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল কথা"। এটা করতে গিয়ে বিভিন্ন দিক বিচার করতে হয়। প্রথমত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিটা কী তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। এই পরিস্থিতির প্রভাব কোথায় কীভাবে পড়তে পারে, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিকে এই পরিস্থিতি কীভাবে প্রভাবিত করবে ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে হবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে একমাত্র মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সবদিক খতিয়ে দেখা ও তার সঠিক মূল্যায়ন— এই দুটো দিক নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক উপসংহার টানার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যদি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা, কিংবা পর্যবেক্ষণে ভুল বা ত্রুটি থাকে, তা হলে বিশ্লেষণও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করার জন্য যে বিশ্লেষণ করা হবে তা করতে হবে বস্তুগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। এটাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বিশ্লেষকের মস্তিষ্কপ্রসূত, কিংবা আগে থেকে ঠিক করা ধারণা, যাকে বলা হয় বিষয়ীগত ধারণা, কোনওভাবেই বিশ্লেষণের পদ্ধতি হবে না। এ ভাবে লেনিনীয় তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগের জন্য অতি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বিশ শতকের সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ইতিহাস পড়ুন। দেখবেন, বিপ্লবে জয়ী হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে এই 'বিষয়ীগত ভাবনার" বিরুদ্ধে কী পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিরন্তর এই সংগ্রাম চালাতে হয়। এর মধ্য দিয়েই পার্টির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব চেতনা বাড়াতে হয়। আর, এই চেতনাই, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, পার্টি সভ্যের রাজনৈতিক- সাংগঠনিক দক্ষতা নির্ধারণ করে থাকে।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভুল মূল্যায়ন আমাদেরকে ভুল রাজনৈতিক লাইন ও সে অনুযায়ী ভুল রণকৌশল গ্রহণের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি, রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে গৃহীত হলেও বাস্তবে এর রূপায়ণ নির্ভর করে সাংগঠনিক ক্ষমতার উপর। এ ক্ষেত্রে স্তালিনের একটি কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক লাইন ১০০ ভাগ সঠিক হলেও এই লাইন জনগণের কাছে নিয়ে যাবার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা সংগঠন গড়তে না পারলে এর কোনও অর্থ থাকে না। জনগণের চেতনা উন্নত করতে ও একটি বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে পার্টি সংগঠনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। পার্টি সংগঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালানো। এর মধ্য দিয়েই জনগণের ব্যাপক অংশের সমাবেশ ঘটিয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে শাণিত করা যায়।

এ পর্যন্ত বলা কথার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সঠিক বোঝাপড়ায় আসার ক্ষেত্রে বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো আবশ্যক। কারণ, এর থেকেই উদ্ভূত হয় সঠিক রাজনৈতিক -রণকৌশলগত লাইন। আর, সঠিক লাইন ছাড়া শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া যায় না। শুধু শ্রেণীসংগ্রামই নয়, লক্ষ্য পূরণে সঠিক সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রশ্নেও বিষয়ীগত প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। পার্টির সব স্তরেই এই সংগ্রাম চালাতে হবে। কারণ, এই বিষয়ীগত ধারণা বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

বিষয়ীগত ধারণা ঃ পর্যবেক্ষণের এক ভুল পদ্ধতি

চীন বিপ্লবের সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি স্কুলের উদ্বোধনী বক্তৃতায় মা ও - জে-দং বলেছিলেন— " বিষয়ীগত ধারণা পর্যবেক্ষণের এক ভুল পদ্ধতি। এটা মার্কসবাদ- লেনিনবাদ বিরোধী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। আমরা চাই পর্যবেক্ষণের পদ্ধতির অর্থ বিদ্যালয়ে পড়ার পদ্ধতি নয়। এটা হচ্ছে নেতৃস্থানীয় কমিটির কমরেডগণ, সব ক্যাডার ও সব পার্টি সভ্যদের চিন্তার পদ্ধতির প্রশ্ন। এটা হচ্ছে আমাদের কমরেডদের যাবতীয় কর্মকান্ডে মার্কসবাদী- লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। এটা একটি চমৎকার ও অবশ্যই মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।" পার্টিস্কুলে আমাদের কমরেডরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে যেন একটা প্রাণহীন গোঁড়া আপ্তবাক্য হিসেবে বিচার না করেন। মার্কসবাদী তত্ত্বকে আয়ত্ত করে তাকে প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। একমাত্র প্রয়োগের জন্যই তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে। আপনি যদি একটি বা দুইটি বাস্তব সমস্যাকে মার্কসবাদী- লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা হলে আপনাকে প্রশংসা করতে হবে এবং কিছু সাফল্যের জন্য আপনার কৃতিত্বকে স্বীকার করতে হবে। এ পদ্ধতিতে যত বেশি সমস্যার ব্যাখ্যা আপনি করতে পারবেন, যত বেশি করতে পারবেন সুসংহত ও গভীরভাবে, তত বেশি আপনি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন। পার্টি স্কুলকেও শিক্ষার্থীদের ভালো ও খারাপ— এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। কীভাবে তা করতে হবে? তা করতে হবে চীনের সমস্যাকে তারা কীভাবে ব্যাখ্যা করেন, কিংবা আমাদের সামনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তারা স্পষ্ট কি, স্পষ্ট নন, এবং আদৌ তারা সমস্যাগুলি দেখেন কি, দেখেন না, তা দিয়ে। (মাও - জে - দং এর নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮)।

মাও যে-কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিনের মার্কসবাদী দর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক উপসংহারে পৌঁছার পদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনে সব ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই না হলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে ব্যাঘাত ঘটে।

তত্ত্বগতভাবে লেনিন কান্টের দার্শনিক অবস্থান বিচার করে ' হেগেলের র্তক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বিষয়ীগত ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিষয়ীগত ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে "পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে এক দিক থেকে গ্রহণ করার মধ্যে।" লেনিন বললেন, " কোনও বিষয়কে তার নির্দিষ্ট সামগ্রিকতার মধ্যে না দেখে শুধু উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বলে দেখানো এবং অনুমান নির্ভর কোনও কিছুও তত্ত্বগত কাজের সহায়ক

হতে পারে— শুধু এই অভিমুখী হওয়া নিতান্তই বিষয়ীগত ধারণার খপ্পরে পড়া ও তার অধীনতা স্বীকার করা। এর ফলে তত্ত্ব দুর্বোধ্য হয়ে যায় এবং শুধু তত্ত্বের সঙ্গে মিল থাকা দিকটাকেই দেখা যায়।" (ভি আই লেনিন, সংগৃহীত, রচনাবলী, খন্ড-৩৮, দর্শন সংক্রান্ত নোটবুক, পৃষ্ঠা-২১০)

সি পি আই (এম) গঠন ঃ ভারতীয় পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ফসল

ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের ভিত্তিতে সি পি আই (এম) গঠিত হয়েছে। ২০-তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কয়েকটি মতাদর্শগত ইস্যুতে প্রস্তাবে বলা হয়েছে : " ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয়েছে শোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে। শোধনবাদী বিচ্যুতি অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এমনভাবে নির্জীব করে ফেলেছিল যে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভারতীয় জনগণের মুক্তিসংগ্রাম লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার হুমকির মুখে পড়েছিল। দীর্ঘসময় ধরে পার্টির অভ্যন্তরে এই শোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে শোধনবাদ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে হয়েছিল। মতাদর্শগত লড়াই চালাতে হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলগত প্রশ্ন নিয়ে এবং ভারতীয় শাসকশ্রেণিগুলির গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নে। সি পি আই (এম) এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের বিপ্লবী পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরেছে এবং ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে।

তার পর- পরই সি পি আই (এম) কে অতি বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এটাও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিপথগামী করার বিপদ তৈরি করেছিল। মতাদর্শগত সংগ্রামের পাশাপাশি পার্টির ওপর নেমে আসা ভয়ঙ্কর আক্রমণকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাতে বহু কমরেড শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

এসব বিচ্যুতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল সংগ্রাম ভারতীয় জনগণের গৌরবোজ্জ্বল জঙ্গী সংগ্রামগুলির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সি পি আই (এম)- এর অভ্যুদয় এবং বৃহত্তম ও শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট ও বামদল হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এ ঘটনায় মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদের মার্কসবাদী - লেনিনবাদী অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

সি পি আই (এম)-র সংগ্রাম ছিল মতাদর্শগত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং মার্কসবাদ- লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্ব ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সব ধরনের বিচ্যুতি ও তার অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতো শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভুলের বিরুদ্ধেও আমাদের

মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে।

এই মতাদর্শগত সংগ্রামগুলি আমাদের পার্টিকে শুধু যে ভারতের বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি ও বামশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে তাই নয়। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে আমাদের চাপ সৃষ্টি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সক্ষম করে তুলেছে। (কোজিকোড়ে ৪-৯ এপ্রিল, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ে প্রস্তাব।)

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচ্যুতির মধ্যে ছিল ভারতীয় বিপ্লবের স্তর, স্বাধীনতা- পরবর্তী ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলির গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিষয়ীগত চিন্তার প্রতিফলন, যা ভারতের তখনকার নির্দিট পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

রুশ বিপ্লবের সময়ে লেনিনকেও এ ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনে বিভিন্ন প্রবণতার শক্তি সম্পর্কে বাস্তব তথ্য তুলে ধরে তিনি প্লেখানভ ও ট্রটস্কি— উভয়েরই বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই চালান। লেনিন লেখেন : " প্রতিটি পদক্ষেপে ওরা চেয়েছেন নিজেদের আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন শ্রমিকদের ইচ্ছা ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজন বলে চালিয়ে দিতে।" (লেনিনের নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা- ৩৮২)।

বাস্তবে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল বিষয়গত। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে লেনিন রুশ বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করেছেন। রণকৌশল সম্পর্কে তাঁর চিঠিতে রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রেণী বিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন:

'বুর্জোয়া- গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর রাশিয়াতে এখনও সম্পন্ন হয়নি এবং কৃষকদের সংগ্রামও ফুরিয়ে যায়নি। এ অবস্থায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ডিঙ্গিয়ে একলাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আওয়াজ তোলা হচ্ছে। আমরা কি বিষয়ীগত ধারণার বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিচ্ছি না?" (ঐ, খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা- ৪৮)

নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে লেনিনের বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রাসঙ্গিকতার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত। বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবসময়েই চলমান। অনেক সময় আমরা একটা ভুল করি। কী ভুল? পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন না করে আমরা আগে থেকে তৈরি হওয়া ধারণা নিয়ে চলতি পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট থাকি। অনেক ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি আমাদের ভুল উপসংহারের দিকে ঠেলে দেয়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় বিষয়ীগত ধারণার কিছু উদাহরণ

এ ধরনের ভুলের বহু উদাহরণ আছে। তবুও একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার ও পরবর্তী নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা কী? ২০-তম পার্টি কংগ্রেসে (২০১২) গৃহীত রাজনৈতিক- সাংগঠনিক রিপোর্টে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহীত মূল্যায়নের পুনরুল্লেখ করে বলা হয়ঃ " এই ইস্যুতে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ২০০৭ সালের অক্টোবর- নভেম্বরেই কার্যকর করা উচিত ছিল। সেই সময়টা কখন? যখন কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনার জন্য আই এ ই এ (আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা)-র কাছে যাচ্ছিল। পরমাণু চুক্তি আটকানোর ওটাই ছিল একটা সুযোগ। সেই সময়ে সমর্থন প্রত্যাহার না করাটা ভুল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব পরমাণু চুক্তি ও আমেরিকার সঙ্গে রণনৈতিক জোট তৈরিতে এতোটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে তারা ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি না করার চেয়ে বামেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করাটাকেই শ্রেয় মনে করেছে। পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি চুক্তি সম্পাদনে শাসকশ্রেণিগুলির দৃঢ়তা ও ক্ষমতা এবং ভারতের সঙ্গে রণনৈতিক জোট গঠনের অঙ্গ হিসেবে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি সম্পাদনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনাসৃষ্টিকারী আগ্রহকে আমরা ছোট করে দেখেছিলাম। অন্যদিকে আমাদের শক্তি ও ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে আমরা বাড়িয়ে দেখেছিলাম। প্রাথমিক কথাবার্তা বলার জন্য আই এ ই এ- তে যেতে অনুমতি দেওয়া এবং এই চুক্তি সম্পাদন না করার পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতি কংগ্রেস দল বিশ্বস্ত থাকবে বলে আমাদের মধ্যে তৈরি হওয়া ধারণা ভুল ছিল। (২০-তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক- সাংগঠনিক রিপোর্ট, ২০১২)।

একইরকমভাবে, নির্বাচনী কৌশল ও নির্বাচনী রণকৌশলগত লাইনও ২০-তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক- সাংগঠনিক রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনী পর্যালোচনা পুনরায় ব্যক্ত করে রিপোর্টে বলা হয় : "পর্যালোচনায় দুটো বিষয় চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমত, অ-কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে জোট গঠনে তিনটি কি চারটি রাজ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যে রাজ্যে এ ধরনের জোট হলেও তা জাতীয় স্তরে নির্বাচনী- বিকল্প গঠনের ভিত্তি হবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে 'বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ সরকার' গঠনের স্লোগান তোলাটা আমাদের ঠিক হয়নি। আমাদের অ-কংগ্রেসী, অ-বিজেপি বিকল্পকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো উচিত ছিল"। (২০ তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট,২০১২)

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি কংগ্রেস আত্মসমালোচনায়

এসব ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে মোটর কারখানা স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের ইস্যুটিকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা হয়নি। তেমনটি ঘটেছে নন্দীগ্রামে। কেমিক্যাল হাব স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণ আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের পূর্বশর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্ট বরাবর যে-কাজটি করে থাকে জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা, তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিস্তারিত বলা, পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্যে কী কী রয়েছে তা বুঝিয়ে বলা, কেন জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন এসেছে, ইত্যাদি নিয়ে জনগণের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তাদের বোঝানো, ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। এর পেছনে প্রধান কারণ হতে পারে, বামফ্রন্ট ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ২৩৫ টি আসন পেয়ে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল। বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল ৫০.১৮। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত শিল্পায়নের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই মহাজয়ের ওপর দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ না করেই সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিল। হয়তো ধারণা হয়েছিল, আমাদের প্রস্তাবিত শিল্পায়নের প্রতি জনগণের সমর্থন তো নির্বাচনে মিলেছেই।

লেনিন অবশ্য বলেছেন, আমরা শুধু বাস্তবতার একটি দিকই দেখি। অন্য দিকটি আমাদের অগোচরে থেকে যায়। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম)'র ভোটের হার ২০০৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পার্টির প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৮.৫৭ থেকে কমে ৩৭.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। এ দিকটির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি। আমরা ভেবেছি, বিধানসভার তিন-চতুর্থাংশ আসন পেয়ে আমরা জয়ী হয়েছি। ভোটের হার সামান্য কমেছে মাত্র। যদি বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হতো তা হলে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়ার আগে করণীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদনের উপর জোর দেওয়া হতো। এটি আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। তাছাড়া বাস্তব পরিস্থিতিকে সামগ্রিকতার মধ্যে বিচার না করার ভুলও আমাদের হয়েছে। ফলে আরও অনেক কিছু মিলিয়ে এ সমস্যাটি জনগণ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করেছে।

জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের বিভিন্ন উপাদান এবং সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্টকে জনগণ থেকে আপাত 'বিচ্ছিন্ন' করতে ভূমিকা নিয়েছে। এ সময়ে সমস্ত বিরোধী দলগুলির নীতিহীন জোট তৈরি হয়েছে। তাতে সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে হিংসাশ্রয়ী মাওবাদীদের জোট হয়েছে। এ জোট হয়েছে ২০০৯ সালের লোকসভা ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়। তাতে পার্টির বড় ধরনের নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছে। ২০০৬ সালে যেখানে বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট-বিরোধীদের প্রাপ্ত ভোটের হার প্রায় কাছাকাছি, সেখানে

চলতি নির্বাচনী পদ্ধতি অনুযায়ী বড় সংখ্যায় আসন আমরা হারিয়েছি।

জমি ইস্যু সামলানোর ক্ষেত্রে আমাদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি কংগ্রেসে আত্মসমালোচনা হয়েছে। পার্টি কংগ্রেস বলেছে — " বাস্তবতার একদিক দেখা" থেকে এই ভুলের সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে পরবর্তী সময়ের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতির মধ্যে।

প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মূল্যায়ন কোনওভাবেই যাতে মনগড়া, অর্থাৎ বিষয়ীগত ধারণা থেকে তৈরি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। পার্টি সংগঠনের দক্ষতাবৃদ্ধি ও বর্তমান কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ, বা বিষয়গত মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

চীনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু উদাহরণ

প্রেক্ষিত ও সময়ের বিচারে বিভিন্নতা থাকলেও চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। মাও- জে- দং এর নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশ করেছে পিপল্‌স পাবলিশিং হাউজ, বেজিং। সম্পাদনার কাজ যারা করেছেন তারা 'অনুশীলন' সম্পর্কে মাও-এর বক্তৃতাটি সংযোজিত করে কিছু মন্তব্য তারা করেছেন।

" আমাদের পার্টিতে এমন বেশ কিছু সংখ্যক কমরেড আছেন যারা গোঁড়া এবং চীন বিপ্লবের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে তারা বাতিল করে দিতে চান। 'মার্কসবাদ কোনও আপ্তবাক্য নয়, কাজের পথনির্দেশক'— এ সত্যটি তারা অস্বীকার করতে চান এবং তারা জনগণের সামনে শুধু মার্কসবাদী কতকগুলি শব্দ ও বাগধারা আউড়ে যান। এসব শব্দ বলে থাকেন প্রসঙ্গ উল্লেখ ছাড়াই। আবার, এমন কিছুসংখ্যক কমরেডও আছেন যারা অভিজ্ঞতাবাদী। তারা দীর্ঘসময় ধরে নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চান এবং বিপ্লবী অনুশীলনে তত্ত্বের গুরুত্বের কথা তারা বুঝতে চান না। তারা বিপ্লবী কর্মকান্ডকে সামগ্রিকভাবে দেখতে অপারগ। কিন্তু অন্ধভাবে শ্রমসাধ্য রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করে যান। এই দুই ধরনের কমরেডদের দু'ধরনের ভুল, বিশেষ করে গোঁড়াপন্থীদের চিন্তাভাবনা, চীন বিপ্লবের ১৯৩১- ৩৪ পর্বে দারুণ ক্ষতি করেছে।

এসবের পরও তারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে জাহির করেন এবং পার্টি কর্মীদের একাংশকে বিভ্রান্ত করেন। পার্টিতে গোঁড়াপন্থী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের বিশেষ করে গোঁড়াপন্থীদের এই ভুল কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে মাও তাঁর 'অনুশীলন সম্পর্কে নিবন্ধ লেখেন। জ্ঞান অর্জনের মার্কসবাদী তত্ত্বকে ভিত্তি করেই এটা লেখা হয়। শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'অনুশীলন' কারণ এটা গোঁড়াপন্থীদের বিষয়ীগত ধারণা, যা কিনা অনুশীলনকে ছোট করে দেখাতে চায়,

তার চরিত্র উন্মোচিত করার লক্ষ্যেই এই নিবন্ধটি লেখা হয়েছে। নিবন্ধটির বিষয়বস্তু মাও-জে- দং জাপ বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে (ইয়েনানে) বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন।"

মাও এখানে মনগড়া ধারণা থেকে পার্টি কমরেডদের মুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এর থেকে মুক্ত থাকার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন : " যদি একজন মানুষ তার কাজে সাফল্য পেতে চায়, অর্থাৎ যে মাত্রায় সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সে কাজ করেছে, সেই মাত্রায় সাফল্য পেতে গেলে তাকে বাইরের বস্তুজগতের নিয়মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যদি সে তা না করে তবে বাস্তবে তাকে ব্যর্থ হতে হবে। তার ব্যর্থতা থেকে সে শিক্ষা নেবে এবং ধারণার সংশোধন ঘটাবে। তখন সে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তখনই কেবলমাত্র ব্যর্থতা সাফল্যে রূপান্তরিত হতে পারে। এর থেকে বলা যায় 'ব্যর্থতাই সাফল্যের জনক' এবং গর্তে পড়লে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে'। (মাও- জে - দং এর নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ২৯৬- ২৯৭)

কমরেড মাও এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। পার্টির কাজের দায়িত্ব প্রতিপালনে কমরেডের ভুল হতে পারে। ভুল করাটা ভুল নয়। কিন্তু, ভুল থেকে শিক্ষা না - নেওয়াটা ভুল। ভুল হলো কেন তার কারণ না বুঝেই বলে দিলাম এ ধরনের ভুল আর হবে না— এটাও ভুল। মূল কথা হচ্ছে, ভুল শোধরাতে হবে এবং বোঝাপড়ায় যে ভুল রয়েছে তা দূর করতে হবে। স্তালিন এক সময় একটি বিখ্যাত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে-সব কমরেড মোটের উপর কাজই করেন না তারা কোনও ভুল করেন না। কাজ করতে গেলে কমিউনিস্টরা ভুল করতেই পারেন। কিন্তু নিজেদের শোধরানোর কাজটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করা সম্ভব।

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, একজন কমরেডকে কোনও কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাও বলেছিলেন : ' এ কাজটি আমি করতে পারব কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই'— এ ধরনের কথা আমরা প্রায়ই শুনি। কাজটির দায়িত্ব নিতে তিনি ইতস্তত করছেন। কেন তিনি নিজের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না? কারণ, যে দায়িত্বটি তাকে দেওয়া হচ্ছে তার বিষয়বস্তু ও পরিবেশ- পরিস্থিতি সম্পর্কে ওই কমরেডের কোনও প্রণালীবদ্ধ ধারণা নেই, কিংবা এ ধরনের কাজে সে অভ্যস্ত নয়, বা এ কাজের কোনও অভিজ্ঞতা তার নেই। ফলে এই কাজের পেছনে যে নিয়ম কার্যকর রয়েছে সে সম্পর্কে তার ধারণা নেই। কাজের চরিত্র ও পরিবেশগত দিকগুলি যদি বিস্তৃতভাবে তাকে বুঝিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে সে আরও আত্মবিশ্বাসী হবে এবং দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা জাগবে। কিছু সময় এ কাজে যুক্ত থাকলে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং যদি সে খোলামনে

দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে তবে সমস্যা থাকবে না। অবশ্য সমস্যাদিকে বিষয়ীগত ধারণা দিয়ে বিচার করলে, একচক্ষু হরিণের মতো বিষয়টির প্রতি নজর দিলে এবং ভাসাভাসাভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ফল হবে উল্টো। অন্যথায় সে নিজে নিজেই বুঝতে পারবে কীভাবে সমস্যাটির পর্যবেক্ষণ করা উচিত ও অনেক বেশি সাহসের সঙ্গে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। যারা বিষয়ীগত ধারণায় বিশ্বাসী, একচক্ষু হরিণের মতো সমস্যাকে দেখে এবং ভাসাভাসা ভাবে চোখ বুলিয়ে যায় মাত্র, সে ধরনের কমরেডরা জায়গায় পৌছে আত্মতৃপ্তি নিয়ে শুধু নির্দেশ বা নির্দেশিকা দিয়েই ক্ষান্ত হন। তারা পরিবেশ- পরিস্থিতি বিবেচনা না করে, সমস্যাটিকে সামগ্রিকতার (তার ইতিহাস ও বর্তমানের সামগ্রিক রূপ) মধ্যে বিচার না করে এবং বস্তুর সত্তা (চরিত্র ও একটির সঙ্গে অন্যটির আন্তঃ সম্পর্ক) সম্পর্কে না জেনে তারা এক ধরনের নির্দেশ জারি করেন। এ ধরনের ব্যক্তিরা হোঁচট খাবেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেন। (মাও-এর নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ৩০২)

এ থেকে এটা পরিস্কার যে ব্যক্তি- কমরেডদের রাজনৈতিক- সাংগঠনিক - মতাদর্শগত দক্ষতা বাড়াতে গেলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সঠিক মূল্যায়নের জন্য চাই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান। এর জন্য কমরেডদের নিয়মিত আপ্তশিক্ষার প্রয়োজন। পার্টির ক্লাশ, মার্কসবাদী চক্র ইত্যাদি পার্টিগত উদ্যোগের পাশাপাশি প্রতিটি কমরেডকে আমৃত্যু আত্মশিক্ষায় নিয়োজিত থাকতে হবে। এটা ছাড়া আশু কর্তব্য সম্পাদনে পার্টি সভ্যদের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব নয়।

জনগণের কাছ থেকে শিখতে হবে

পার্টি গঠনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কিত রিপোর্ট উপস্থাপনের সময় লিউ- শাউ-কি যে বক্তৃতা করেছিলেন তা পরে 'পার্টি প্রসঙ্গে' শিরোনামে একটি চটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন : ' জনগণই তাদের ইতিহাস তৈরি করে। তাদের মুক্তি অবশ্যই নির্ভর করবে তাদের সচেতনতা ও আগ্রহের উপর। তারা নিজেদের অগ্রগামী বাহিনী স্থির করে এবং অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্বে তারা নিজেদের সংগঠিত করে ও নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালায় । এর মাধ্যমেই তারা সচেতনভাবে সংগ্রামে অর্জিত ফসলগুলিকে সংরক্ষিত ও সুসংহত করতে পারে। জনগণের শত্রুদের উৎখাত করতে পারে একমাত্র জনগণই। এছাড়া অন্য কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। জনগণের সত্যিকারের চেতনা ও সমাবেশ ছাড়া শুধু অগ্রগামী বাহিনী এ কাজ করতে পারে না। সামনের দিকে এগোতে পারে না। যে কোনও সাফল্য অর্জনেই জনগণের সচেতন ভূমিকা আবশ্যক। এমনকি, খাজনা ও সুদ কমানোর মতো আশু জনস্বার্থ নিয়ে কিংবা শ্রম-বিনিময় গোষ্ঠী ও সমবায় গঠনের প্রশ্নেও জনগণের

উপর নির্ভর না করে কিংবা তাদের সংগঠিত- শক্তির উপর ভরসা না রেখে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা যায় না। এসব কর্তব্য সম্পাদনে জনগণের স্বেচ্ছামূলক ও সচেতন অংশগ্রহণ খুবই জরুরি।"

জনগণের স্বার্থই কমিউনিস্টদের স্বার্থ। আমাদের কর্মসূচী বা নীতিমালা যত সঠিকই হোক না কেন তা জনগণের সমর্থন ও গণসংগ্রামে ব্যাপকতর জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া এই সঠিক জিনিষটিও কাজে আসতে পারে না। সুতরাং সব কিছুই নির্ভর করে ও নির্ধারিত হয় জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনগণ কিছু করতে চায় কিনা- তার ওপর। এটা ছাড়া আমাদের সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। তার জন্য তাদের জাগাতে ও সংগ্রামের ময়দানে সমবেত করতে পার্টির সঠিক নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা আবশ্যক। এটা করতে পারলে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি সবক্ষেত্রেই আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারব। জনগণ যখন পুরোপুরি জাগ্রত হয়নি, সেখানে কমিউনিস্টদের, জনগণের অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সচেতন করার জন্য যে কোনও কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ ও নানা উপায়ে তা রূপায়িত করা। আমাদের কাজের প্রথম ধাপই হচ্ছে এটা। কাজটি যত কঠিনই হোক কিংবা যত সময়ই লাগুক না কেন আমাদের এই কাজটি করতেই হবে। তখনই কেবল আমরা দ্বিতীয় ধাপের কর্তব্য হাতে নিতে পারব। (লিউ- শাউ- কি'র নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ৩৪৭)।

এবং " জনগণের কাছ থেকে শেখার পরিবর্তে আমরা যদি নিজেদের চতুর ভেবে জনগণের চেতনা বাড়ানোর কাজে লিপ্ত হই এবং আমাদের মনগড়া কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা কিছু কর্মপ্রকল্প তাদের উপরে যান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দিই, তা হলে আমাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। জনগণের কাছ থেকে অনবরত আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও জনগণ থেকে আমাদের আলাদা হওয়া চলবে না। যদি আমরা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি, তা হলে আমাদের জ্ঞান মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং আমাদের অবশ্যই চতুর হওয়া চলবে না, বরং জনগণের অবস্থা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবহিত থাকব এবং জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে আমাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে যেতে হবে।" (ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৪৯)

কাজের ধারায় পরিবর্তন আনো

বিষয়ীগত ধারণা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তসমূহকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে। একজন কমরেডের কাজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা মূল্যায়নে বিষয়ীগত ধারণা ওই কমরেডকে ভুল

দায়িত্ব দিতে প্ররোচিত করে। কমরেডের ভুল মূল্যায়নের জন্য পার্টিতে পছন্দ- অপছন্দের প্রবণতা তৈরি হতে পারে এবং এটা আবার ব্যক্তি-কমরেডের যথাযথ মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করে। এটা পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে ভয়ানক বিপজ্জনক। স্তালিন এক জায়গায় বলেছেন একজন ভালো সংগঠকের দায়িত্ব হচ্ছে 'ঠিক কাজের দায়িত্ব ঠিক কমরেডকে দেওয়া'। বিষয়ীগত ধারণা এই প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নেতৃত্বের মধ্যে পছন্দ- অপছন্দের মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডারদের মধ্যে চাটুকারিতা ও নেতৃত্বকে খুশি রাখার প্রবণতার জন্ম দেয়। এর ফলে নিচুতলার পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন নেতৃত্বকে খুশি রাখার মতো করে রিপোর্ট দেওয়া হয়। তাতে জনগণের প্রকৃত মনোভাব ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নেতৃত্বের নিকট যথার্থ রিপোর্ট পৌঁছে না।

আমাদের অভিজ্ঞতা কি? বিগত দশকে নিচুতলা থেকে যেসব রিপোর্ট এসেছে তা ছিল বিষয়ীগত ধারণাপ্রসূত নিজস্ব শক্তিকে বাড়িয়ে দেখানোর ভুলে ভরা। এটা আমাদের দুই অগ্রবর্তী ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়নে ভুল ছিল। এমনকি, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরও পার্টি কেন্দ্রে পাঠানো সম্ভাব্য ফলাফলের রিপোর্ট ঠিক ছিলো না। নির্বাচনী ফল বেরুবার পর দেখা গেল আমাদের মূল্যায়ন কতটা ভুল ছিল। এটা হলো কেন? হয় আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তি ছিল বিষয়ীগত ধারণা, কিংবা নেতৃত্ব যা শুনতে চায় সেভাবে নিচুতলা থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। এটা পরিস্কার যে আমাদের রিপোর্ট ছিল মনগড়া। জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির যোগাযোগ যে আলগা হয়ে গিয়েছিল তা হিসেবে না এনে বিষয়ীগত ধারণা থেকে আমরা উপরে রিপোর্ট দিয়েছি। নীচুতলা থেকে যে রিপোর্ট হয়েছে তা হয়তো হয়েছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য সমর্থকদের মুখ থেকে শুনে। হয়তো এরা ইতোমধ্যে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোনও শিবিরে চলে গেছে। অবাস্তব রিপোর্টের পেছনে এসব কারণের সমন্বিত রূপ কিংবা আরও কিছু উপাদান কাজ করে থাকতে পারে।

সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিষয়ীগত ধারণা কমরেডদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে বিচ্যুতি তৈরি করতে পারে। ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, কমরেডদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ইত্যাদির দিকে আমাদের ঠেলে দিতে পারে। এসব অভিব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল মূল্যায়নে আমাদের অবশ্যই প্ররোচিত করে এবং জনগণের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হচ্ছে পার্টিতে বিষয়ীগত, বা মনগড়া ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। এটা করতে হবে পার্টির সব স্তরেই। এই লড়াই চালাতে হবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক বাস্তবসম্মত মূল্যায়নে পৌঁছার জন্য এবং পরিস্থিতিগত

যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে তাকে নির্দিষ্টভাবে বোঝবার জন্য। বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন করার জন্য। এটাই হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রে সঠিক মার্কসবাদী- লেনিনবাদী পদ্ধতি। এর দ্বারাই পরিচালিত হবে সাংগঠনিক পদ্ধতি ও পদক্ষেপ।

পার্টির রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইন কী হবে তা নির্ভর করে এই বাস্তবসম্মত, বা বিষয়গত মূল্যায়নের উপর। এই প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল হলে পার্টির রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে পার্টি শোধনবাদী, কিংবা অতিবাম বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে ভারতীয় পরিস্থিতিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি। বিপ্লবের এই স্তর নির্ধারিত হয়েছে ভারতীয় পরিস্থিতির মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পরিস্থিতির কী ধরনের বিকাশ ঘটেছে, তা মূল্যায়ন করার জন্য বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। এই কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা চাইবো শ্রেণীশক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন আমাদের অনুকূলে আনতে। আমাদের দেশের বিপ্লবী রণনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম শক্তিশালী করতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমাদের একান্ত প্রয়োজন ।

সি পি আই (এম) অনেক আলোচনার পর ২১-তম পার্টি কংগ্রেসে চলতি রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন গ্রহণ করেছে। অবশ্য, কলকাতায় অনুষ্ঠেয় সাংগঠনিক প্লেনামে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেগুলো হবে আমাদের রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইন রূপায়ণে কীভাবে আমাদের সংগঠনকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারি। অন্যদিকে, জনগণের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শক্তিশালী করাই হবে আমাদের সামনে প্রধান কর্তব্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং সঠিক সাংগঠনিক পদ্ধতি, যা কিনা ভারতীয় জনগণের সঙ্গে পার্টি নেতা-কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করবে— এই তিনটি ক্ষেত্রেই বহু রূপে প্রকাশিত বিষয়ীগত ধারণার বিরুদ্ধে সমগ্র পার্টিকে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটাই আজকের দিনে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

সি পি আই'র কর্মসূচি প্রসঙ্গে

প্রকাশ কারাত

একটি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে তার কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক দলিল। এই কর্মসূচিতে পার্টির রণনীতিগত লক্ষ্য নির্ণয়ের সাথে বিপ্লবের সমগ্র স্তরও নির্ণীত হয়ে থাকে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর এইরকম কর্মসূচি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতভেদ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য প্রচণ্ডভাবে বিরাজ করেছিল। শাসকশ্রেণীর চরিত্র, রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র এবং তদনুযায়ী ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি নির্ণয় এবং কর্মসূচি গ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রায় এক দশকব্যাপী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই)-র মধ্যে আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম চলেছিল।

অবিভক্ত পার্টিতে একটি সর্বসম্মত পার্টি কর্মসূচি গ্রহণের শেষ চেষ্টা হয়েছিল ১৯৬১ সালের বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কংগ্রেসে। সেই কংগ্রেসে দুটি খসড়া কর্মসূচি পেশ হয়েছিল, কিন্তু অসামাধানযোগ্য মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়নি।

অবশেষে ১৯৬৪ সালে সি পি আই'র ভাঙন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হবার পর দুটি পার্টি আলোচনা করতে সক্ষম হয়ে পৃথক পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করে। মুম্বাইয়ে সি পি আই-র সপ্তম কংগ্রেসে এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র সপ্তম কংগ্রেসে ওই কর্মসূচি দুটি গৃহীত হয়। দীর্ঘকাল ধরে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পরেও কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি গ্রহণে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পৃথক পার্টি গড়ে নিজেদের কর্মসূচি গ্রহণ করাই সমাধানের একমাত্র পথ ছিল। কী রণকৌশল গ্রহণ করা হবে, শুধুমাত্র এই নিয়ে যদি মতপার্থক্য থাকতো বা মতাদর্শগত বিষয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যদি দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতো তাহলে পার্টিতে ভাঙন হতো না।

দুই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মৌলিক রণনীতিগত দলিল গ্রহণ করার পর ছয় দশক কেটে গেছে। এই সময়কালে দুটি পার্টি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইশ্যুতে এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রণকৌশলগত লাইন অনুসরণ করতে একটি সাধারণ

বোঝাপড়ায় আসতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে তারা একসঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে এবং বামপন্থী ঐক্যও মজবুত হয়েছে।

২০০০ সালে তিরুবনন্তপুরমে এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে সি পি আই (এম) তার কর্মসূচি সময়োপযোগী করেছে। মূলত শ্রেণী সম্পর্কের নিরিখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, সংশোধিত এবং সময়োপযোগী করা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের স্তর, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শ্রেণীমিত্র ও তার নেতৃত্ব সম্পর্কে কর্মসূচিতে যে মৌলিক সূত্রায়ন করা হয়েছিল তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ কংগ্রেসেই কর্মসূচি সময়োপযোগী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তারপর আট বছর ধরে পার্টি কর্মসূচি সময়োপযোগী করার কাজ চলেছিল।

দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা

সি পি আই সম্পর্কে বলা যায়, একটি নতুন কর্মসূচির খসড়া প্রণয়নে তাদের অনেক দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং অনেক স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচি পুনর্লিখনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে একটি খসড়া প্রণয়ন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত মতো সাত সদস্যের খসড়া প্রণয়ন কমিশন গঠিত হয় এবং তারা যে খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করেন সেটি ১৯৮৯ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ কংগ্রেসে পেশ করা হয়। কিন্তু ওই কংগ্রেস খসড়া গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৯২ সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ কংগ্রেসে একটি খসড়া কর্মসূচিগত দলিল আলোচিত হয় এবং একটি 'কর্মসূচি দলিল' গৃহীত হয়। এটি ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ, যেখানে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ আলোচিত হয়েছিল। সেটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পার্টি কর্মসূচি ছিল না, কারণ ওই দলিলে রাষ্ট্রের চরিত্র, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণীমিত্র কারা হবে ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়নি।

সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ একটি খসড়া কর্মসূচি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গঠন করে। সেই প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

অবশেষে, ২০১৫ সালের মার্চ মাসে পুদুচেরিতে অনুষ্ঠিত ২২তম পার্টি কংগ্রেসে একটি নতুন পার্টি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যেহেতু দীর্ঘ সময়কাল ধরে আলোচনার পর এই কর্মসূচি রূপ পেয়েছে, তাই সি পি আই'র ভবিষ্যৎ চলার পথের ক্ষেত্রে এবং দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য থাকছে।

তাই সি পি আই-র কর্মসূচির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা কাজের কাজই হবে।

বিপ্লবের স্তর এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের জন্য শ্রেণী বিশ্লেষণ, বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিস্থাপন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানোর জন্য বিপ্লবী ফ্রন্টের শ্রেণীমিত্র এবং নেতৃত্ব নির্ণয় করাই হলো পার্টি কর্মসূচির মর্মবস্তুর ভিত্তি।

রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র

১৯৬৪ সালে গৃহীত সি পি আই এবং সি পি আই (এম) উভয় দলের কর্মসূচিতে বিপ্লবের স্তরকে গণতান্ত্রিক স্তর হিসেবেই সূত্রায়িত করা হয়েছিল। অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী কর্তব্য সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তাই ওই সূত্রায়নে স্বীকৃত হয়েছিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রায়নের প্রশ্নকে ঘিরে এবং শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে যে বিপ্লবী শ্রেণীমোর্চা গড়ে তোলা প্রয়োজন, তার চরিত্র নির্ণয়কে ঘিরে মতপার্থক্য দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর মধ্যে প্রধান শোষকশ্রেণী কারা, তা স্থির করার জন্যই ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এই শাসকশ্রেণীই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার চরিত্র নির্ধারণ করে। রণনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ওই বিশ্লেষণই নির্ধারণ করে দেয় কে প্রধান শত্রু এবং কাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হবে।

রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

সি পি আই (এম) তার কর্মসূচিতে রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছে এইভাবে:

বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া ও জমিদারদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র, ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের লক্ষ্যে যারা ক্রমেই বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। দেশের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এই শ্রেণী চরিত্রের দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয়।

সময়োপযোগী কর্মসূচিতে রাষ্ট্রের এই শ্রেণী চরিত্রায়নই বজায় রাখা হয়েছে। ১৯৬৪ সালের কর্মসূচিতে সি পি আই রাষ্ট্রের চরিত্রায়ন করেছিল নিম্নরূপ:

ভারত রাষ্ট্র হলো সামগ্রিক বিচারে জাতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র; এই রাষ্ট্র পুঁজিবাদকে সমর্থন করে এবং ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক, বণ্টন ও বিনিময়ের বিকাশ চায়।

সরকারি ক্ষমতা গঠন এবং প্রয়োগে বৃহৎ বুর্জোয়ারা যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব খাটায়।

জাতীয় বুর্জোয়ারা ভূ স্বামীদের সাথে আপস করে, তাদের মন্ত্রিত্বে নেয় এবং সরকারি

পদে সুযোগ দেয়, বিশেষ করে রাজ্য স্তরে।

১৯৬৮ সালে সি পি আই 'র অষ্টম কংগ্রেসে এই সূত্রায়ন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত পরিচ্ছেদটি হলো নিম্নরূপ:

ভারত রাষ্ট্র হলো সামগ্রিক বিচারে জাতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণীশাসনের যন্ত্র, যেখানে বৃহৎ বুর্জোয়াদের শক্তিশালী প্রভাব আছে। ভূস্বামীদের সাথে এই শ্রেণীশাসনের জোরালো যোগসূত্র আছে। এই সকল কারণে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁক দেখা দেয়।

দুটি কর্মসূচিতে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট এবং এই পার্থক্য দুটি পার্টিরই রণনীতি, শ্রেণী মিত্র এবং কৌশল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

সি পি আই (এম)-র কর্মসূচির সাথে মূল পার্থক্যের বিষয়টি ছিল নিম্নরূপ:

সি পি আই (এম)-র কর্মসূচি অনুযায়ী যে শ্রেণীমোর্চা ভারতীয় রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নেতৃত্বে আছে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী। সি পি আই'র কর্মসূচিতে বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছিল এবং তাদের ১৯৬৪ সালের কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা 'যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব খাটায়'। ১৯৬৮ সালে সংশোধনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'শক্তিশালী প্রভাব আছে'।

ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি কর্মসূচিতে মতভেদের প্রধান বিষয় ছিল এটাই। একেবারে প্রথম থেকেই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা শক্তিশালী অংশ হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশে বিপরীতটাই ঘটেছিল। সেখানে বৃহৎ বুর্জোয়া এবং একচেটিয়া স্তরের উদ্ভব হয়েছিল দেরিতে, পুঁজিবাদী বিকাশের পরিপক্ক স্তরে। উপনিবেশবাদী শাসনের বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতে যে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছিল তা পূর্ণ বিকাশের আগেই বৃহৎ বুর্জোয়া এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিকাশ শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক দশকের মধ্যেই বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিকাশ এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণীর উপরে তাদের প্রাধান্য এবং নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই শক্তিশালী হয়েছিল।

রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী থাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণে এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী উন্নয়ন ঘটেছে। এই রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করেছে এবং ভূস্বামীদের সাথে মিত্রতা গড়েছে। সি পি আই (এম)'র কর্মসূচিতে বলা হয়েছে:

রাষ্ট্রের উপর তাদের কর্তৃত্বকে তারা ব্যবহার করেছে একদিকে জনগণের উপর আক্রমণের জন্য, অন্যদিকে চাপ, দর কষাকষি ও সমঝোতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামীতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিরোধ সমাধানের জন্য।

এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে চলেছে।

সি পি আই'র কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রকে বলা হয়েছিল সামগ্রিক বিচারে জাতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসন, যেখানে বৃহৎ বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দেয় না কিন্তু শক্তিশালী প্রভাব খাটায়। এছাড়াও সি পি আই (এম)-র কর্মসূচিতে যেখানে বলা হচ্ছে, বুর্জোয়া-ভূস্বামী জোটই হচ্ছে এই রাষ্ট্র শক্তির ভিত, সেখানে সি পি আই কর্মসূচিতে উল্লেখ করা হচ্ছে, এই রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে শুধুমাত্র 'ভূস্বামীদের শক্তিশালী সম্পর্ক আছে'। ভূস্বামীরা রাষ্ট্র কাঠামোর কোনও অংশ নয় এবং সেই যুক্তিতে শাসকশ্রেণীর অংশও নয়।

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি কর্মসূচিতে আরও একটি পার্থক্যের ক্ষেত্র হলো, সি পি আই (এম) মনে করে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে শাসকশ্রেণী বিদেশি লগ্নিপুঁজির সাথে সহযোগিতা করে চলে। অর্থাৎ সি পি আই (এম)-র সূত্রায়ন অনুযায়ী শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে এবং রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে ভূস্বামীতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ— উভয়েরই গভীর সংযোগ আছে। কিন্তু সি পি আই এ কথা বলে না। সি পি আই মনে করে, শাসকশ্রেণীর শাসন কাঠামো যাই হোক সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশি লগ্নিপুঁজির কোনও ভূমিকা নেই।

রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই যে ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, তার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। সি পি আই যেহেতু মনে করে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামগ্রিক বিচারে জাতীয় বুর্জোয়ারাই রয়েছে এবং বৃহৎ বুর্জোয়ারা শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রভাব খাটায়, তাই রাষ্ট্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-র পার্থক্য থাকতে বাধ্য। এছাড়াও ভূস্বামীরা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণকারী শাসকশ্রেণীর সহজাত অংশ না হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে অতিধারণা পোষণ করা হয়েছিল। "জাতীয় বুর্জোয়াদের" ভূমিকা সম্পর্কেও একই অতিঅনুমান করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রকে জাতীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র হিসেবে চরিত্রায়িত করার অর্থ দাঁড়ায় ভারত রাষ্ট্র শত্রুশ্রেণীর রাষ্ট্র নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা একইসঙ্গে একদিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে আবার অপরদিকে সি পি আই'র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাব্য অংশীদার হয়ে আছে। জাতীয় বুর্জোয়ারা এমন শ্রেণী, প্রগতিশীল অভিমুখে চলার জন্য শ্রমিকশ্রেণী তাদের খোঁচা দেবে, পরিচালনা করবে এবং ঠেলা দেবে। শুধু তাই নয়, বৃহৎ বুর্জোয়ারা, সাম্রাজ্যবাদ এবং ভূস্বামীরা রাষ্ট্রকে "প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে টেনে" নিয়ে যেতে চাইলে তাকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য করবে। ১৯৫৬ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো, রাষ্ট্র সম্পর্কে সি পি আই'র ধারণা ছিল তারই অনুসারী এবং তার দ্বারা প্রভাবিত।

এরই প্রভাবে শাসকশ্রেণী সম্পর্কে এবং শাসকশ্রেণীর প্রধান দল কংগ্রেস সম্পর্কে

সি পি আই নরম মনোভাব গ্রহণ করেছিল। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব— যা হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী— তার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র এবং শাসক দল সম্ভাব্য মিত্র হতে পারবে। শাসকশ্রেণীর মধ্যে ভূস্বামী এবং সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি না রাখার কারণেই সি পি আই'কে ঐরকম রণনীতিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছিল। রাষ্ট্রের এই চরিত্র নির্ণয়ের ফলেই কৌশলগত ক্ষেত্রে সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (যেমন ১৯৯৬ এবং ২০০৪ সালে) সি পি আই বুর্জোয়া দল নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার ইচ্ছা দেখিয়েছিল।

নতুন খসড়া কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য আলোচনাকালে রাষ্ট্রের এই চরিত্রায়নের বিষয়টিও পর্যালোচনা করার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে যে খসড়া কর্মসূচি পেশ করা হয়েছিল তাতেও রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যায় কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি; ১৯৬৮ সালের অষ্টম কংগ্রেসে সংশোধিত খসড়াটিই আবার পেশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল:

সামগ্রিক বিচারে ভারত রাষ্ট্র হলো জাতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র, যার উপর বৃহৎ বুর্জোয়াদের শক্তিশালী প্রভাব আছে। ভূস্বামীদের সাথে এই শ্রেণী শাসনের জোরদার সংযোগ আছে। এই সবের ফলেই রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব ঘটে। খসড়া কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য যে কর্মসূচি কমিশন গঠিত হয়েছিল তার আহ্বায়ক জগন্নাথ সরকার ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের চরিত্রায়ন সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে তিনি সংশোধনী দিয়েছিলেন। ওই সংশোধনীর প্রথম অংশে বলা হয়েছিল:

ভারত রাষ্ট্র হলো ভারতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র, ভূস্বামীরা হলো এই রাষ্ট্রের মিত্র এবং বৃহৎ বুর্জোয়ারা এই রাষ্ট্রকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাথে ভূস্বামীদের মৈত্রী বন্ধন এবং রাষ্ট্রের উপর বৃহৎ বুর্জোয়াদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁক প্রবেশ করাচ্ছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হলো বুর্জোয়ারা এবং চিরাচরিতভাবেই তাদের সঙ্গে ভূস্বামীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরকালে সামন্তবাদী রাজন্যবর্গ এবং বৃহৎ ভূস্বামীরা সাধারণভাবে ব্রিটিশ শাসনকেই সমর্থন জুগিয়েছিল; কিন্তু মধ্য এবং ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা সাধারণভাবে উপনিবেশবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল। এই ঘটনা ভূস্বামীদের রাজনৈতিক আঙিনায় বুর্জোয়াদের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও এই মিত্রতা বজায় থেকেছে (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচি, কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, ১৯৮৯)।

জগন্নাথ সরকারের সূত্রায়ন অনুযায়ী, বৃহৎ বুর্জোয়ারা ভারত রাষ্ট্রের উপর "চূড়ান্ত

নিয়ন্ত্রণ" প্রয়োগ করছে। এছাড়াও তার দেওয়া সংশোধনীতে স্বীকার করা হয়েছে, বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক আছে। পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী স্তর হিসেবে বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিশেষ চরিত্রকে ব্যক্ত করার জন্যই তিনি "জাতীয় বুর্জোয়া" শব্দটি ব্যবহার পরিহার করে গেছেন।

কর্মসূচি কমিশনের অপর এক সদস্য পি কে বাসুদেবন নায়ারও তার সংশোধনীতে বলেছিলেন, বৃহৎ বুর্জোয়ারা "চূড়ান্ত প্রভাব" প্রয়োগ করছে।

২২তম কংগ্রেসে যে নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

"(৮.১) ভারত রাষ্ট্র কর্পোরেট বৃহৎ ব্যবসায়ী ও একচেটিয়াপতিদের নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়াদের শ্রেণীশাসনের যন্ত্র। এই শ্রেণীশাসনের সঙ্গে আধা সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী ভূস্বামীদের শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। এটাই সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে। এর নির্দেশেই কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যাংক এবং আই এম এফ'র মতো আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।"

"জাতীয় বুর্জোয়া" শব্দটি আর ব্যবহার করা হয়নি; এটি সঠিক পদক্ষেপ। অতীতের সূত্রায়ন থেকে বেরিয়ে এসে মেনে নেওয়া হয়েছে যে ভারত রাষ্ট্র হলো বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র, যার নেতৃত্বে আছে "কর্পোরেট বৃহৎ ব্যবসায়ী ও একচেটিয়াপতিরা"। ভূস্বামীদের সঙ্গে সংযোগকে আগের মতোই বলা হয়েছে " শক্তিশালী যোগসূত্র" এবং ভূস্বামীদের চরিত্র বলা হয়েছে, " আধাসামন্তবাদী" এবং "পুঁজিবাদী" বলা হয়েছে রাষ্ট্রকাঠামো " আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে"। অতীতে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয়নি, এটি নতুন বৈশিষ্ট্য।

ভারতে বুর্জোয়া পরিচালিত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে রয়েছে কর্পোরেট বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং একচেটিয়াপতিরা— এ কথা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে সি পি আই অতীতের থেকে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রের অনেকবেশি সঠিক বর্ণনা করেছে। এই চরিত্র নির্ণয়ের আগে শ্রেণী বিকাশের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে:

"পুঁজিবাদী বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি হলো, অল্প কিছু সংখ্যক বৃহৎ একচেটিয়া কারবারির হাতে পুঁজি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, যেসব একচেটিয়া কারবারিরা জনস্বার্থ এবং এমনকি বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশেরও স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের বিত্তশালী করে তোলে।"

কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়া এই শব্দের পরিবর্তে "কর্পোরেট বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং একচেটিয়াপতি"

শব্দগুলি কেন ব্যবহার করা হলো তা বোঝা কষ্টকর। "বৃহৎ বুর্জোয়া" এমন একটি সুসম্পূর্ণ শব্দ যার মধ্যে বৃহৎ পুঁজির সব অংশকেই ধরা যায়। পাবলিক লিমিটেড/ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ইত্যাদির মতো কর্পোরেট বা কর্পোরেশন শব্দগুলি হলো মালিকানার আইনগত রূপ। বৃহৎ কর্পোরেটগুলি এবং বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি হলো বৃহৎ বুর্জোয়াদেরই অংশমাত্র। এছাড়াও উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজিলগ্নি হয়ে থাকে; যেমন সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন ক্ষেত্রেও বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রয়েছে। এই সব কিছু মিলিয়ে যখন পুঁজির কেন্দ্রীভবন একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যায় তখন তাকে অবশ্যই বৃহৎ বুর্জোয়ার অংশ বলেই ধরতে হবে। "কর্পোরেট বৃহৎ ব্যবসা এবং একচেটিয়াপতি " সূত্রায়নের উদ্দেশ্য সঠিক হলেও এই সূত্রায়নের দ্বারা "বৃহৎ বুর্জোয়া" এবং শব্দের সম্পূর্ণ পরিসরকে ধরা যায় না।

রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে ভূস্বামীদের বাইরে রাখাটাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রায়নের দুর্বলতার দিক। কৃষিতে উৎপাদনই পুঁজিবাদী বিকাশের অন্যতম প্রধান রূপ হয়ে ওঠায় পুঁজিবাদী ভূস্বামীতন্ত্র সেখানে নির্ধারকের ভূমিকায় রয়েছে। কৃষিতে আধা-সামন্তবাদী ভূস্বামীতন্ত্র ধারাবাহিকভাবে দুর্বল হচ্ছে না। সুতরাং বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই ভূস্বামীতন্ত্রের কেবলমাত্র " শক্তিশালী যোগসূত্র" আছে একথা বলার কোনও ভিত্তি নেই। তারা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যেহেতু আধা - সামন্তবাদী সম্পর্কগুলি এখনো অবশিষ্ট থেকে গেছে তাই 'ভূস্বামী' শব্দটি পৃথকভাবে এখনও ব্যবহৃত হয়।

সি পি আই'র কর্মসূচিতে এক জায়গায় 'গ্রামীণ বুর্জোয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ভূস্বামীরা এই গ্রামীণ বুর্জোয়ার অংশ। সুতরাং তাদের রাষ্ট্রকাঠামোর বাইরে রাখাটা অবাস্তব। ভূমিসংস্কার সম্পাদনের কাজ পরিহার করার জন্য বুর্জোয়ারা ভূস্বামীদের সঙ্গে যে সমঝোতা করেছিল ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য সেই বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করাই হলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম কর্তব্য।

আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি এবং ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্রের বিষয়টি সি পি আই -র কর্মসূচিতে স্বীকৃতি পেয়েছে; এটি একটি সঠিক অভিমুখ। ভারতে পুঁজিবাদী পথে বিকাশের জন্য রাষ্ট্র নিজেই আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি এবং ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাথে সহযোগিতা করে চলতে চায়; এই যুক্তিপূর্ণ উপসংহারেই সি পি আই পৌঁছালে ভালো হতো। সি পি আই (এম)'র সূত্রায়নে যে কথা বলা হয়েছে তা হলো: " ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের লক্ষ্যে ক্রমেই বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে।"

সব মিলিয়ে বলা যায়, সি পি আই'র কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রের যে চরিত্র নির্ণয় করা হয়েছে তা ভারত রাষ্ট্রের সঠিক চরিত্র নির্ণয়ের দিকে অগ্রবর্তী পদক্ষেপ, যদিও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এখনও কিছু সমস্যা ও দুর্বলতা থেকে গেছে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করবে কারা ?

গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে শ্রেণী মোর্চা বা ফ্রন্ট কাদের নিয়ে হবে এবং সেই মোর্চার নেতৃত্ব কারা দেবে এই প্রশ্নেও দুই পার্টির কর্মসূচিতে মতপার্থক্য ছিল।

দুটি পার্টির কর্মসূচিতেই বলা হয়েছিল বিপ্লবের স্তর হবে গণতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক মোর্চা বা ফ্রন্টে কোন্ কোন্ শ্রেণীকে টেনে আনতে হবে। কিন্তু ফ্রন্ট বা মোর্চার নেতৃত্বের প্রশ্নে দুই কর্মসূচিতে পার্থক্য ছিল। সি পি আই তাদের ফ্রন্টকে বলেছে "জাতীয় গণতান্ত্রিক" ফ্রন্ট, আর সি পি আই (এম) তাদের ফ্রন্টকে বলেছে "জনগণতান্ত্রিক" ফ্রন্ট (বা মোর্চা)।

সি পি আই তাদের ১৯৬৪ সালের কর্মসূচিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চাকে ব্যাখ্যা করেছিল এইভাবে:

"জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্তৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে একটি পরিবৃত্তিকালীন স্তর, সেই স্তরে যে সকল শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে অপসারিত করতে চাইবে, আধা সামন্তবাদীদের পরাজয় ঘটাতে চাইবে এবং একচেটিয়াপতিদের শক্তি উদ্ভবের উচ্ছেদ ঘটাতে আগ্রহী থাকবে তারা যুক্তভাবে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করবে। এই মোর্চায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এককভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, আবার বুর্জোয়াদের একক নেতৃত্বও এই মোর্চায় থাকছে না।"

সি পি আই (এম) যখন এই বলে সমালোচনা করে যে, শ্রমিকশ্রেণীর একক নেতৃত্ব থাকছে না, আবার বুর্জোয়া শ্রেণীরও একক নেতৃত্ব থাকছে না— এর অর্থ দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর যুগ্ম নেতৃত্ব থাকছে, তখন সি পি আই তাদের অষ্টম কংগ্রেসে আরও ব্যাখ্যা হাজির করে শেষে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করে। তাতে বলা হয় : "এই মোর্চার নেতৃত্ব হবে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী এবং একচেটিয়া শক্তি বিরোধী।" এই সূত্রায়নের পরেও বিভিন্ন শক্তির যুগ্ম নেতৃত্বের বিষয়টি থেকেই গিয়েছিল।

১৯৬৪ সালের কর্মসূচিতে তার পরের পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছিল:

" যেহেতু জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার ও যে শ্রেণীমৈত্রীর তা প্রতিনিধি, উভয়ই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত, অতএব এই শ্রেণী মৈত্রীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশই অধিকতর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, কারণ এই শ্রেণীই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সচেতন

উদ্যোগী ও নির্মাতা।"

সি পি আই'র কর্মসূচিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যুগ্ম নেতৃত্বের (শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের) ধারণাকেই তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীতে সি পি আই (এম)-র কর্মসূচিতে বলা হয়েছে:

(৭.১) ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্যসমূহের সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সমাধানের জন্য বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বদলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক কর্তব্য।

এরপরে আরও বলা হয়েছে যে—

বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবার আবশ্যিক সোপান হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে। তাই এটা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত পুরানো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। (প্যারা ৭.২)

এটা কোনও গোঁড়ামির কথা নয় বরং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির বুর্জোয়ারা আর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে ভারতে যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতার নেতৃত্বে আছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা, সেখানে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী জোটের রাষ্ট্রকে উৎখাত করাই হলো প্রধান কর্তব্য। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর জোট শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। অবশ্য অবৃহৎ বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অংশ হতে পারে। দৃঢ় মিত্র হিসেবে তাদের উপর আস্থা রাখা যাবে না এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর শক্তির উপরই তাদের ভূমিকা নির্ভর করবে। ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী ছয় দশকেরও বেশি সময়কালের পর এবং বিশেষ করে নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদ শুরুর পরবর্তী পর্যায়ে বৃহৎ বুর্জোয়া এবং অবৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সি পি আই-র কর্মসূচিতে সমকালীন ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থেকে গেছে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পর্যায়ে এবং সমাজতন্ত্র উত্তরণের প্রস্তুতিকালে সি পি আই-র নতুন কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের যুগ্ম নেতৃত্বের ধারণাকেই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে:

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই কর্তব্য সমাপন করার জন্য তৎপর স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি হলো শ্রমিকশ্রেণী, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত, শ্রমজীবী কৃষক, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী অংশ এবং মধ্যবর্গীয় ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের একটি অংশ। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে এরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব থেকে

সরিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কালপর্বে দেশকে নেতৃত্ব নিতে পারে।" (প্যারা ৯.১)

সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালীন পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী থেকে শুরু করে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র বুর্জোয়া পর্যন্ত সকলেই নেতৃত্ব দেবে বলে যে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মধ্যেই যে প্রশ্নটি অস্বচ্ছ বা অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে তা হলো বৃহৎ বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদ এবং আধা-সামন্তবাদের অবশিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় নেতৃত্ব দিতে কে বা কারা সক্ষম!

সি পি আই'র কর্মসূচিতে বলা হচ্ছে, উত্তরণের সমস্ত পর্যায় জুড়ে এমন একটি শ্রেণী মোর্চা কাজ করে যাবে যার নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী থাকবে না। এটুকুই বলা হচ্ছে একটি দীর্ঘকাল পর্বব্যাপী এবং উত্তরণের শেষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং তার ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক মোর্চা প্রতিষ্ঠিত হবে।

"এটা খুব মসৃণ প্রক্রিয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে অনেক ওলট-পালট ও সামাজিক উত্থান-পতন ঘটবে, যার পরিণতিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বের পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক মিত্রশক্তির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এক্ষেত্রে সি পি আই-র দৃষ্টিভঙ্গি এবং সি পি আই (এম)-র বোঝাপড়ার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

সি পি আই (এম) মনে করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণ একমাত্র তখনই সম্ভব যদি গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং উত্তরণের সমস্ত কালপর্বব্যাপী বিপ্লবী শ্রেণীমোর্চায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। সি পি আই-র কর্মসূচি মনে করে উত্তরণ পর্যায় সমাপ্ত হবার পরই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

সি পি আই (এম) বিশ্বাস করে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান রাষ্ট্রকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু সি পি আই এ কথা বিশ্বাস করে না। সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সি পি আই যেভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে তার মধ্য দিয়েই সেটা বোঝা যায়। সি পি আই-র কর্মসূচিতে বলা হয়েছে:

"শক্তিশালী গণবিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলে, সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য সম্প্রসারিত করে এবং এ ধরনের গণআন্দোলনের সাহায্যে সংসদে স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীরা প্রতিক্রিয়া শক্তির সমস্ত রকম বাধা কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে এবং এভাবে সমাজে মৌলিক রূপান্তর সাধনের জন্য জনসাধারণের ইচ্ছাপূরণের প্রকৃত হাতিয়ার হিসেবে সংসদের উত্তরণ ঘটাবে।" (৯.৪)

একথা বলার অর্থ দাঁড়ায়, বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে কাজ করেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। ১৯৬৪ সালের কর্মসূচিতে এই ধারণা রাখা হয়েছিল যে ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, একচেটিয়াপতি বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী কিছু নিহিত শক্তি আছে; সেই ধারণার রেশই বর্তমান সূত্রায়নের মধ্যে থেকে গেছে।

শ্রেণী বিশ্লেষণ

কর্মসূচিতে নির্ণীত রণনীতির কিছু কিছু দুর্বলতার কারণ নিহিত রয়েছে অসম্পূর্ণ আবার কখনও কখনও সারগ্রাহী শ্রেণী বিশ্লেষণের মধ্যে। ভারতীয় সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই হবে পার্টি কর্মসূচি নির্ধারণের ভিত্তি; এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে কারা শাসক শ্রেণী এবং কোন্ কোন্ শ্রেণী ও জনগণের কোন্ অংশ শোষিত তা চিহ্নিত করার জন্য ভারতীয় সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জরুরি।

জমিদারতন্ত্রের অনুপস্থিতি

কর্মসূচিতে 'স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৃষি সম্পর্ক' অধ্যায়ে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের অনেক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু জমিদারতন্ত্রের চরিত্রের কোনও বিশ্লেষণ সেখানে নেই। কিভাবে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী ভূস্বামী স্তরের উদ্ভব ঘটলো, কিভাবে বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষকের আবির্ভাব হলো এ সবের কোনও বিশ্লেষণ কর্মসূচিতে অনুপস্থিত। ভূস্বামী এবং অন্যান্য বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষকদের হাতে জমি এবং অন্যান্য সম্পদবিত্তের কেন্দ্রীভবন এখনও যে ঘটে চলেছে তারও কোনও উল্লেখ এখানে নেই। জমি এবং অন্যান্য সম্পদের উপর ভূস্বামীদের শক্তিশালী দখল এখনও থেকে গেছে একথা উল্লেখ না করেই এই অধ্যায়ে ভূমি সংস্কার সম্পাদন, জমির জন্য সংগ্রাম ইত্যাদির কথা লেখা হয়েছে। পুঁজিবাদী শাসনে কৃষকদের মধ্যে যে নানা ভাগ তৈরি হয়েছে, তার খুব সামান্য বর্ণনাই এখানে রাখা হয়েছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিভিন্ন সামাজিক স্তরের (যেমন গরিব কৃষক, মধ্য কৃষক এবং ধনী কৃষক) ভূমিকার উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রামে তাদের কার কি ভূমিকা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যাবে না বা বোঝা যাবে না।

কৃষক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে মাত্র একটি অনুচ্ছেদ সত্যিই, গ্রামীণ শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

বৃহৎ চাষিদের লবিগুলো এই নতুন নীতি সম্পর্কে দ্ব্যর্থবোধক মনোভাব দেখায়। শুরুতে ব্যবসার উদারীকরণ এবং কৃষি বাণিজ্য কর্মসূচিকে তাদের পক্ষে লাভজনক বলেই বিবেচনা করছিল। পরবর্তীকালে তারাও এই মুক্ত বাণিজ্যের বিরোধিতা করা শুরু করেছে এবং সংরক্ষণ

জাতীয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক পরিসরকে রক্ষা করতে চাইছে।

বড় চাষিরা যে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করে, মাঝারি ও ছোট চাষিরা সাধারণত সেটাকেই অনুসরণ করতে চায় এই আশায় যে এতেই তারা প্রতিদান পাবে চড়া হারে।

ছোট এবং প্রান্তিক চাষিদের সম্পর্কে বলা যায় যে তারা ক্রমশই বেশি বেশি করে তাদের জমি এবং অন্যান্য সম্পদভিত্তি থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। (অনুচ্ছেদ ৬.৬)

এখানে যে "বড় চাষি"দের কথা বলা হচ্ছে তারা কি জমিদার, নাকি পুঁজিবাদী কৃষক, নাকি ধনী কৃষক? 'মাঝারি এবং ছোট চাষিরা' মধ্য কৃষক বা গরিব কৃষক হতে পারে।

"শ্রেণী ও অন্যান্য অংশ: তাদের ভূমিকা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে গ্রামীণ বুর্জোয়া এবং পুঁজিবাদী ভূস্বামীদের যে ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত করেই বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

পুঁজিবাদী ভূস্বামী, ধনী কৃষকরা ভূমি সংস্কার ও জমি বণ্টনের জন্য ভূমিহীন শ্রমিকদের সংগ্রামে যোগ দেয় না।

কিন্তু অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে— যেমন উপকরণের চড়া দরের বিরুদ্ধে, পরিকাঠামোগত সুযোগ- সুবিধার দাবিতে, লাভজনক দরের জন্য এবং কৃষিকে টেকসই রাখার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে লড়াইতে এবং রাষ্ট্রের তরফে জোর করে কৃষি জমি দখল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে এরা সকলেই যোগ দিতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৭.১৫)

উপরের ব্যাখ্যা থেকে এটাই মনে হয় যে, গ্রামীণ বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী ভূস্বামী এবং ধনী কৃষক সকলেই সব বিষয় নিয়ে কৃষি সংগ্রামের অংশ। কিন্তু এতে করে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের ভূমিকার ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। বাস্তবে, ভূস্বামী এবং ধনী কৃষকরা সংগ্রামে যোগ দেয় রাষ্ট্রের সম্পদবিত্তের ভাগ বেশি করে পাবার স্বার্থে; সেগুলি ভরতুকি, ঋণ বা পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আরও কিছু হতে পারে। এই আন্দোলনে তারা কৃষকদের অন্যান্য অংশকেও সমবেত করে। কিন্তু বুর্জোয়া -জমিদার শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা কখনই অংশীদার হবে না। বাস্তবে, তারা গণতান্ত্রিক কৃষি আন্দোলনের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেবে।

ভূস্বামীরা যে রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক শাসক শ্রেণীরই অংশ এই সত্যটা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কৃষি মজুর, গরিব কৃষক এবং গ্রামীণ গরিবদের উপর তারা যে শ্রেণী শোষণ চালায় তার কোনও বিশ্লেষণ করা হয়নি। এই শ্রেণী বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত রাষ্ট্রশক্তি এবং শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে শক্তিশালী কৃষি আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব হবে এবং বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলাও সম্ভব হবে না।

শিল্প এবং বাণিজ্যিক পুঁজি বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে নয়া উদারবাদী

অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিণতির মাত্র একটি দিকের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে একটি ক্ষমতাশালী কর্পোরেট স্তরের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলি বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাথে একের পর এক অংশীদারিত্ব প্রবেশ করছে। কর্পোরেট পুঁজিবাদের উপরই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

বৃহৎ পুঁজির সমস্ত অংশ যারা বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত হয়েছে নজরটা সেদিকেও প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু বৃহৎ কর্পোরেটরাই নয়, অন্যান্য আরও অনেক ধরনের পুঁজি মালিকানা এবং সম্পদবিত্তের নিয়ন্ত্রকরা অন্তর্ভুক্ত আছে।

আঞ্চলিক এবং অবৃহৎ বুর্জোয়া

আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের অবস্থানের বিষয়টিও যথেষ্টভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের বহুল অংশই অবৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যেই পড়ে। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। বৃহৎ বুর্জোয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি লক্ষ্য করাই বর্তমানে আর যথেষ্ট নয়। উদারীকরণের ফলে অবৃহৎ বুর্জোয়ারাও তাদের পুঁজি বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে এবং সর্বভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবৃহৎ আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের কিছু কিছু অংশ তাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুঁজির মূল ভিত্তি বজায় রেখেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের দলে ঢুকে পড়েছে।

বৃহৎ বুর্জোয়া এবং অবৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের একটি দিক ছিল অবৃহৎ বুর্জোয়াদের সাথে বিদেশি পুঁজির টেকসই যোগসূত্রের অভাব। উদারীকরণের পর তা পরিবর্তিত হয়েছে। অবৃহৎ বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশ বিদেশি পুঁজির সাথে সহযোগিতায় আবদ্ধ হবার এবং তার থেকে উপকৃত হবার সুযোগগুলি ব্যবহার করেছে। এইসব ঘটনার ফলে বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের অবৃহৎ অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের কোনো প্রতিফলন সি পি আই'র কর্মসূচিতে ধরা পড়েনি। মোটামুটিভাবে, সি পি আই-র কর্মসূচিতে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা ইতিবাচক আলোকেই দেখা হয়েছে, একইসাথে কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে লেখা হয়েছে:

এই আঞ্চলিক দলগুলি বিশেষ বিশেষ রাজ্য এবং অঞ্চলের মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তাদের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এইসব মানুষের দাবিদাওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি। তাদের কণ্ঠেই ফুটে উঠছে এইসব অঞ্চলের মানুষদের ক্ষমতায়নের আর্জিটাও।... কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এই আঞ্চলিক দলগুলির পরিস্থিতির

চাহিদামতো কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতে ইচ্ছুক।

এই ধরনের চরিত্রায়নের উদ্দেশ্য হলো এইসব আঞ্চলিক দলকে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করা।

বিগত দুই দশক ধরে আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে যেসব নতুন পরিবর্তন ঘটেছে, সি পি আই (এম)'র সময়োপযোগী কর্মসূচিতে সেসবের আলোচনা করা যায়নি; কিন্তু পরবর্তী সময়ে পার্টির বিভিন্ন প্রস্তাবে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও অবস্থান এবং আঞ্চলিক দলগুলির উপর তাদের কার্যকর প্রভাবের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সেটা কৌশলগত দিক হলেও আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের পরিবর্তিত শ্রেণী ভূমিকার একটি রণনীতিগত দিক আছে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সি পি আই'র নতুন কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। এই চরিত্র নির্ণয় রাষ্ট্র সম্পর্কে সি পি আই (এম)-র বোঝাপড়ার অনেক কাছাকাছি এসেছে। কর্মসূচির আরও অনেক দিক রয়েছে যেখানে পুঁজিবাদী বিকাশের পরিবর্তনগুলি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উপর তার প্রভাব সম্পর্কে খুব সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য, এরপরেও শ্রেণী বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে গেছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তুলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার প্রসঙ্গটি এখনও অস্বীকৃত থেকে গেছে। এইভাবেই পুরানো বোঝাপড়ার রেশ এখনও থেকে গেছে, যার প্রভাব বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সি পি আই-র কৌশলগত লাইনে পড়েছে। এসব সত্ত্বেও সি পি আই যে সমস্ত বিষয় পুনঃপর্যালোচনা করে দেখছে সেটা খুবই উৎসাহজনক ঘটনা। ২২তম কংগ্রেসে নতুন কর্মসূচি গৃহীত হবার সাথে সাথেই এ বি বর্ধনের নেতৃত্বে একটি কর্মসূচি কমিশনও গঠিত হয়েছিল; বলা হয়েছে এই কমিশন কর্মসূচি সময়োপযোগী ও আরও স্বচ্ছ করার জন্য কাজ করবে। এ বি বর্ধনের দুঃখজনক মৃত্যুর পরেও আশা করি সেই কাজ অব্যাহত থাকবে।

চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং কী কৌশল অনুসরণ করা প্রয়োজন এইসব নিয়ে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই নিয়মিত আলোচনা করে চলছে। দুটি পার্টির মধ্যে চলতি মত বিনিময় এবং সমন্বয় রেখে চলার মাঝে কর্মসূচিগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাও কাজের কাজই হবে বলে মনে হয়।